জোড় বিজোড়

জোড় বিজোড়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৯

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

জোড় বিজোড়

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের তেইশ বছর পর ফাল্গুনের এক মোহময় রাতে সায়ন তার নব-পরিণীতা স্ত্রী তিতিরের মুখোমুখি হলো। আজ বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। বউভাতের দিনভর ব্যস্ততা আর হৈ-হৈ এখন স্তিমিত। বাইরে এঁটো-কাঁটার স্তূপে ঘেয়ো কুকুরদের ঝগড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কলতলায় বিশাল বিশাল ডেগ আর কড়াই মজার শব্দ উঠছে। আত্মীয়স্বজন যারা রয়ে গেছে তারা বেশীর ভাগই বাড়ির যত্রতত্র শুয়ে পড়েছে, দু-চারজন জেগে আছে, নিচু স্বরে কথা কইছে তারা। এ ছাড়া মোটামুটি রাতটি শব্দহীন, একটু পরে আরও শব্দহীন হয়ে যাবে। এ ঘরে রজনীগন্ধার তীব্র গন্ধ উঠেছে। গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে তিতিরের গা থেকেও, প্রচুর সুগন্ধ মাখানো হয়েছে তাকেও।

তেইশ বছরের লাজুক সায়ন এই মুহূর্তটিকেই ভয় পাচ্ছিল সবচেয়ে বেশী। একটি অচেনা মেয়ে আর সে যখন একখানা ঘরে একা এবং মুখোমুখি হবে তখন কী করবে সায়ন? সায়নের বুক কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে এবং মাথাটা খুব ভোঁ ভোঁ করছে। সে গরদের পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির নিচে একটু ঘেমেও যাচ্ছে। অদূরে নতুন পালঙ্কের ওপর সোনা আর বেনারসীতে মোড়া তার তথাকথিত বউ, যার মুখখানা পর্যন্ত সে ভাল করে দেখেইনি। পালঙ্কের ছত্রি থেকে শুরু করে পায়া অবধি ফুলে ফুলে সাজানো। নতুন বিছানা, তাতে মহার্ঘ চাদর, তার ওপরেও গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো। ষোড়শী তিতির দু-হাঁটু জড়ো করে তার ওপর মাথা রেখে লুকিয়ে আছে। নতুন বউদের এইটেই চিরাচরিত ভঙ্গি।

ফুলশয্যার এই রাত সায়নের কাছে কত ভয়াবহ তা কেউ বুঝবে না। মেয়েদের দিকে সে তাকায় না কখনও। কথা বলে না, মেশবার তো প্রশ্নই ওঠে না। মা, মাসী-পিসী বা খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো-মামাতো-মাসতুতো বোন বা দিদিরা ছাড়া অন্য কোনও মেয়ে বা মহিলার ছায়ামাত্র তার জীবনে নেই। তার ওপর সে স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত বলে অনেকদিন ব্রহ্মচর্য রক্ষার চেষ্টা করে এসেছে। আর তার মা-বাবা এক-মাত্র সন্তান বলে তাকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের মতো। দুই ধারে দুই বিশাল পাহাড়, মাঝখানে ছায়াচ্ছন্ন এক উপত্যকাই যেন সে, অর্থাৎ সায়ন।

সায়নকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো খুব সহজ কাজ ছিল না, সহজ হয়ওনি। বাধ সাধল তার কুষ্ঠী আর বাবার এক রহস্যময় অসুখ। কুষ্ঠীতে কী লেখা আছে কে জানে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন বড় জ্যোতিষী বিচার করে বলেছেন, তার আয়ু কম। রিষ্টি আছে। তার মা-বাবার তাই দিন-রাত ভয়ে ভয়ে কাটে। একদিন, মাস ছয়েক আগে, তার বাবা তাকে ডেকে বললেন, শোন, তোর কোষ্ঠীটা ভাল নয়।

সায়ন উদাসভাবে বলল, শুনেছি তো অনেকবার।

বাবা গলাখাঁকারি দিয়ে একটু পৌরুষ দেখিয়ে বললেন, ওসব আমি তেমন মানি-টানি না। তবে বলাও যায় না। এটাও হয়তো একটা সায়েন্স। যাই হোক, কোষ্ঠীটা তেমন ভাল নয়।

অত ভাবছেন কেন? কোষ্ঠী সবসময়ে মেলে না।

মা বসে পানের বাটা নিয়ে খুটখাট করছিলেন ঘরের কোণে, এবার বলে উঠলেন, মেলে কি না মেলে তা দেখার জন্য বসে থাকব নাকি? আমি দেখেছি বাপু, ভালটা না মিললেও খারাপটা ঠিক ফলে যায়।

সায়ন মৃদুস্বরে বলল, তাহলেই বা আমাদের কী করার আছে? তাবিজ কবচ ঝাড়ফুঁক মাদুলি ডাক্তার বদ্যি তো কিছু কম হলো না।

সায়নের কথাটা অতিশয় ঠিক। সত্যিই ডাক্তার বদ্যি থেকে শুরু করে তাবিজ কবচ সবই তাকে সেই শিশুকাল থেকে সয়ে নিতে হয়েছে। বাহুতে এখনও তার চার-পাঁচটা মাদুলি ঝুলছে। আঙুলে অন্তত চার রকমের পাথর বসানো আংটি। সায়নকে পনেরো-ষোলো বছর বয়স অবধি একা রাস্তায় যেতে দেওয়া হয়নি। তার বিপজ্জনক খেলাধুলো বারণ ছিল। তার বারণ ছিল বাইরের খাবার খাওয়া। তারপর অবশ্য ধীরে ধীরে সায়ন সাইকেল, সাঁতার ফুটবল সবই শিখে নিতে থাকে কিন্তু অনেক বাধানিষেধ ডিঙিয়ে। পুরোপুরি সাবালক বা আত্মনির্ভরশীল হতে তার কিছু সময় লেগেছে এবং সে আজও পুরোপুরি তা হয়নি।

মা বললেন, তা কি হয়? রিষ্টি যেমন আছে, তেমন আবার মুষ্টিযোগও আছে।

বাবা বললেন, কখন কী হয় বলা যায় না, কিন্তু যাই হোক তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া ভাল।

সায়নের মনে হচ্ছিল, তাঁরা দুজন, অর্থাৎ তার মা আর বাবা

আগে থেকে শেখা এবং মুখস্থ করা কোনও পার্ট বলে যাচ্ছিল। এ দুটি মানুষকে সায়ন খুব ভালই চেনে বলে বুঝতে পারছিল, এই আচরণের পিছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

বাবা আবার একটু কাশি-টাশি দিয়ে বললেন, আমার লাং কমপ্লেনটাও ভাল ঠেকছে না। এক্স রে রিপোর্টও খুব ধোঁয়াটে। তিনজন ডাক্তার তিন রকম বলছে।

এই প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর। বাবা এবং মাকে সায়ন প্রাণপাত ভালবাসে, আদর আর খবরদারির অত্যাচার সত্ত্বেও। বাবার অসুখটা যে একটু গোলমেলে সেটা জানার পর থেকেই সায়নের মন আজকাল ভাল থাকে না। সে মৃদুস্বরে বলে, জানি। ডাক্তাররা এখনও তেমন খারাপ কিছুও তো বলেনি।

বলছিল। গতকাল ডাক্তার সেনগুপ্ত বলি-বলি করেও পুরোটা বলল না। সে যাকগে, মরতে আমার তো কোনও ভয় নেই, চিন্তা শুধু তোমাকে নিয়ে, আর চিন্তা বংশরক্ষার, বুঝেছো ?

বুঝলাম না তো, বংশরক্ষার চিন্তাটা আবার কিরকম ?

খুবই সোজা, অবস্থা বিশেষে মানুষকে প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কাজ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করতে হয়। তোমাকেও সেরকমই একটা দায়িত্ব দিতে চাই। তোমার মায়েরও খুবই ইচ্ছে, একটিমাত্র সন্তান থাকলে কত চিন্তা হয় মানুষের জানো তো !

বাবা, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না !

বোঝাবার জন্যই তো বলছি। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা বিস্তারিত না জানিয়ে হুট করে তো আর প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলতে পারি না, তাহলেই তো বেঁকে বসবে।

মা পান মুখে দিয়ে বললেন, ভণিতা ছেড়েই বলছি, এবার একটা বউ আনতে চাই। অমত করতে পারবি না !

বিস্ময়ে সায়ন কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারেনি। বাইশ বছর দশ মাস বয়সে কেউ বিয়ের কথা ভাবে নাকি আজকাল ? সে বেশ

কিছুক্ষণ বাদে স্খলিত গলায় বলে, তার মানে ?

সঙ্গে সঙ্গে বাবা মুখস্থ করা পার্টের পোঁ ধরে বললেন, কাজটা বোধহয় সঙ্গত হচ্ছে না, সে আমরাও বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি কি চাও আমি ছেলের একটা গতি না করে দিয়ে চলে যাবো ? সেটা কি ভাল হবে ? একটি বংশধরকে যদি চোখে দেখে যেতে পারি তাহলেও অনেক সান্ত্বনা।

এইভাবেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। দুই প্রবল দখলদার, দুই স্নেহ-রাক্ষস তাকে বরাবর ইচ্ছে মতো চালিয়েছেন। এবার এক বিষম আপত্তিকর প্রস্তাব, এক অসম্ভব পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা মাঠে নেমেছেন। বরাবর এ দুজনেই জয়ী হন। এবার তাঁদের হারিয়ে দেবে বলে কোমর বাঁধল সায়ন। সে অনশন, গৃহত্যাগের হুমকি, এবং এমন কি কয়েকদিনের জন্য বন্ধুর বাড়িতে চলে যাওয়া ইত্যাদি পন্থা নিয়ে দেখল।

ফল হলো উল্টো। তার বাবা সত্যি সত্যিই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলেন। ডাক্তার দত্ত ঠারেঠোরে ক্যানসারের আভাস দিচ্ছিলেন। সায়ন সত্যিই ভয় পেয়ে গেল।

শেষ অবধি অবশ্য ক্যানসারের সন্দেহটা অমূলক বলে প্রমাণ

হলো, কিন্তু ফুসফুসে যে শ্লেষ্মা জমে আছে সেটা খুব স্বস্তি-বাচক ব্যাপারও নয়। সায়নের বাবা হাসপাতাল থেকে রোগা ও ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে ফিরে এলেন। হাঁটিতে চলতে কষ্ট হয়। ঠাণ্ডা জল ছুঁতেই পারেন না। গ্রীষ্মকালেও গরম জামা পরে থাকতে হয়। মানুষ শুধু তো ক্যানসারেই মরে না, সামান্য সামান্য অসুখ-বিসুখও শরীরকে নিয়ে যেতে থাকে। সায়নের বাবার ফুসফুসও সেরকমই একটা আভাস দিতে লাগল। মাঝে মাঝে হাঁফের টান উঠে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলল পরিস্থিতি। বিজয়বাবু অর্থাৎ সায়নের বাবা একদিন ফের ছেলেকে ডাকলেন নিজের ঘরে। সকালবেলাতেই তাঁকে কেমন যেন ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। বললেন, শরীরের অবস্থা আমি ভাল বুঝছি না। মানুষের অনেক সাধ-আহ্লাদ থাকে। আমার সেসব কিছু নেই। আমি শুধু মরার আগে জেনে যেতে চাই যে, আমার বংশরক্ষার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। তোমার কাছে এটুকু কি খুব বেশী চাওয়া হবে ?

সায়ন অধোমুখ হয়ে বলল, আপনার দিক থেকে দাবিটা খুবই সংগত। কিন্তু আমারও যে একটা দিক আছে। এখনও জীবনে আমি প্রতিষ্ঠিত নই। পড়াই এখনও শেষ হলো না। আমার সম্পর্কিত দাদা-দিদিদেরও অনেকেরই বিয়ে হয়নি। বন্ধুবান্ধবদের তো নয়ই। আমি এখন বিয়ে করলে সেটা কেমন দেখাবে ?

বিজয়বাবু সামান্য উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা একটু অসংগত মনে হতো, কিন্তু পরিস্থিতি তো স্বাভাবিক নয়। তুমি বিয়ে করবে আমার মুখ চেয়ে। লোকে তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে ভাবছো ? ওটা কোনও ব্যাপার নয়। তুমি আরও একটু ভেবে দেখ। আমার মনটা বড় অশান্ত, বড় চঞ্চল। শুধু তোমার মুখ থেকে একবারে 'হ্যাঁ' শব্দটা শুনলেই আমার বুকখানা জুড়োয়।

সায়নের কোনও পথ খোলা ছিল না আর। সে দুদিন সময় নিয়ে ভাবল আর ভাবল। ইতিমধ্যে বিজয়বাবু তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়েও সস্ত্রীক নানা জায়গায় পাত্রী দেখে বেড়াতে লাগলেন। পনেরো-ষোলো বছর বয়সের মেয়েদের বিয়ের কথা আজকাল আর কেউ চিন্তা করে না। মেয়েরাও এই বয়সে আজকাল আর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে নারাজ। তবে ব্যতিক্রম তো আছেই। আর মেয়ের বাপ-মায়েরা হঠাৎ সুযোগ এলে সেটা হাতছাড়া করা সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করেন না। সুতরাং কয়েকদিনের মধ্যেই বহু পাত্রীর ফটো, কোষ্ঠী ইত্যাদি জড়ো হতে লাগল বাড়িতে। ঘন ঘন আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত ঘটতে লাগল। যোটক বিচার করতে ডেকে আনা হলো এক পণ্ডিতকে। পাত্রী সম্পর্কিত আলোচনায় বাড়ি গরম।

দুটি বিবাহিতা খুড়তুতো ও জ্যাঠতুতো দিদি, দুই পিসী এবং এক মামাতো ভাই অহরহ বোঝাতে লাগল সায়নকে। শুধু টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই দুদিন বাদে সায়ন এক সকালে বিয়েতে সম্মতি দিয়ে দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। তবে বলে দিল, সে পাত্রী বা পাত্রীর ফটোও দেখতে আগ্রহী নয়। বাবা-মা যাকে পছন্দ করবেন তাকেই বিয়ে করবে সে।

আরও মাসখানেক বাদে বিয়ের পাত্রী স্থির হলো। আত্মীয়-স্বজনরা বিস্তর ঝোলাঝুলি করা সত্ত্বেও সে দেখতে গেল না মেয়েটিকে। এমনকি ফটো অবধি দেখল না। তার প্রতিবাদ এরকমভাবেই জানাল সে। আর কি করার আছে তার? মন বিষিয়ে রয়েছে বিরক্তি আর লজ্জায়। সারাক্ষণ অস্বস্তিতে কন্টকিত তার দিনরাত্রি। সে মাকে ডেকে একদিন বলল, তোমরা বিয়েতে কি পণ বা দানসামগ্রী নিচ্ছো মা?

মা অবাক হয়ে বলেন, তোদের বংশে তো পণ নেওয়ার রেওয়াজই নেই। পণ নিতে যাবো কেন রে? তবে দানসামগ্রী

না চাইলেও তারা হয়তো নিজে থেকেই দেবে।

সায়ন মাথা নেড়ে বলল, না মা। কোনও দান-সামগ্রী চলবে না, আমি কিছুই নেবো না।

হাতঘড়ি বা সোনার বোতাম বা আংটি যদি দেয়?

কিছুই না।

বেশ বাবা, তাই হবে। কিন্তু মেয়েকে যদি তারা কিছু দেয় সেটা তো আর আটকাতে পারবো না।

সায়ন একটু চড়া গলায় বলে, আজকালকার মেয়েরাও স্বার্থপর মা। তারা নিজেরাও নাকি বাবা মাকে চাপ দিয়ে নানা জিনিস আদায় করে। তোমরা মেয়েটাকে বলে দিও ওরকম কিছু যেন না হয়।

মা একটু হেসে বললেন, সেরকম মেয়েই নয়। দেখলেই বুঝবি। তুই কি ভেবেছিস শুধু চেহারা দেখে আনছি? স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল। লেখাপড়ায় দারুণ মাথা, গান জানে, খেলাধুলোতেও ভাল।

সেরকম মেয়ে এই বিয়েতে রাজী হবে কেন? তোমরা জবরদস্তি রাজী করাওনি তো! তাহলে কিন্তু আমি বিয়েতে মত দিচ্ছি না।

মেয়ের কথা থাক। তার আগে বল তো বাবা, তুই কোন নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করছিস? তোকে রাজী করাতে আমাদের কম হয়রান হতে হয়েছে?

ভ্রূ কুঁচকে সায়ন বলে, তাহলে মেয়েটা স্বেচ্ছায় এই বিয়ে করছে না?

তেমন বেশী আপত্তিও করেনি। প্রথম দিকে একটু অরাজী ছিল, তা সে সব মেয়েই ওরকম করে।

না, মা। আমার শর্ত হলো, পাত্রীকে জোর-জবরদস্তি করা চলবে না।

জোর করা হয়নি। বোঝানো হয়েছে। তুই আর গণ্ডগোল করিস না। তোর বাবার কানে গেলে রোগা মানুষটা আবার

শয্যা নেবে। বিয়েতে রাজী হয়েছিস বলে লোকটা এখন খুশিতে ডগমগ করছে। দেখে কেমন যেন ভরসা হয়, মনটা ভাল থাকলে শরীরটাও হয়তো সেরে উঠতে পারে।

সায়ন অতএব সংযত করল নিজেকে। তার জীবনটা যে ব্যর্থ হয়ে গেল, একটা বিয়েই যে তার জীবনে সব উন্নতির পথরোধ করে দিল, এ ব্যাপারে তার সন্দেহ নেই। মা-বাবার একমাত্র সন্তান হওয়া যে কত বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, তা তার মতো আর কে বুঝবে ?

বিয়েতে নিজের বন্ধুদের আনুষ্ঠানিক নেমন্তন্ন করার ইচ্ছে ছিল না সায়নের। তবে শেষ অবধি ছাপা কার্ড পাঠাতে হলো। তাতে নিজের হাতে লিখে দিল, এ বোধহয় আমার আত্মহত্যা। তোদের ইচ্ছে হলে এসে দেখে যাস।

বন্ধুরা ছাড়ল না। এল। বেশ বড়সড় বাহিনীই এল। পাত্রীপক্ষ বিশাল বড়লোক এবং প্রাচীনপন্থী। একসময়ে জমিদারী ছিল এদের। বিয়ের আয়োজনটা হলো বিশেষ জাঁকাল রকমের। মেহবুব ব্যান্ড পার্টি এল। এল বরযাত্রীদের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাস। বরের জন্য বিশাল ঠাণ্ডা গাড়ি। ফুলে ফুলে ঢাকা। বরকর্তাদের জন্য আরও ছয়খানা গাড়ি। একখানা গোটা বাগানবাড়ি জুড়ে বিয়ের বিশাল আসর বসল। তার সাজ-সজ্জা দেখার মতো। এরা এত বড়লোক, তবু কেন যে সায়নের মতো অপরিণত পাত্রকে পছন্দ করল কে জানে! সায়নকে দেখতে অবশ্য পাত্রীপক্ষের কেউ আসেনি। কিন্তু সায়ন শুনেছে, তারা নাকি আবডাল থেকে তাকে দেখে গেছে। সায়নের বাড়ির অবস্থা ভাল, তার ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল। কিন্তু এই বিপুল ধনাঢ্যতা তাদের নেই। সায়ন এই আয়োজন দেখেও বিরক্ত হলো। বন্ধুদের বলল, এরা বোধহয় জামাই কিনছে।

বন্ধুদের মধ্যে অবশ্য ভিন্নমতই দেখা গেল। অধিকাংশের মত হলো, বিয়ে হলে এরকমই হওয়া উচিত। ঘ্যাম বিয়ে।

পরশু দিনটা বড় ভয়াবহ কেটেছে সায়নের। বিয়েবাড়ির ধুমধাম, আলো, বাজনা, ভিড় তাকে এমন নার্ভাস করে দিচ্ছিল যে বলার নয়। সারা বাড়ি ম-ম করছিল নানা ফুল আর এসেন্সের গন্ধে। সোনা হীরে সিল্কের এরকম সমাবেশ খুব বেশী দেখেনি সায়ন। বড়লোকি ব্যাপারটিকে সে দুচোখে দেখতে পারে না। কারণ সবরকম ধনাঢ্যতার পিছনেই কিছু দুর্নীতি আছেই।

উপোসী শরীর এবং অবসন্ন মনে সে যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসল এবং যন্ত্রের মতো মন্ত্রোচারণ করতে লাগল তখন পুরো অনুষ্ঠানটিকেই তার হাস্যকর রকমের অসাড় মনে হচ্ছিল। অচেনা একটি মেয়ে তার জীবনে অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশ করতে চলেছে, আর সেই ঘটনাটিকে মহিমান্বিত করার জন্যই না এত

ফাঁকা আওয়াজ আর এত চোখ-ধাঁধানো ব্যবস্থা! শুধু একটা জিনিস ভাল লাগছিল সায়নের। পুরোহিতটি এলেবেলে নন। স্পষ্ট, পরিষ্কার গলায় শুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত বহুকাল শোনেনি সায়ন। ভদ্রলোক পণ্ডিত এবং শুদ্ধাচারী সাত্ত্বিকের মতোই দীপ্ত চেহারা। বেশ তেজী। চোখ দুখানাও তীক্ষ্ম। সায়ন নিজের গরজে খানিকটা সংস্কৃত জানে, ইনজিনিয়ারিং-এর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও।

মন্ত্রপাঠের এক ফাঁকে পুরোহিত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সংস্কৃত কোথায় শিখেছেন?

সায়ন লজ্জা পেয়ে বলে, এক চতুষ্পাঠীতে। শখ করে শেখা।

চমৎকার উচ্চারণ। বাঃ, বড় সন্তুষ্ট হলাম। আজকাল ছেলেদের জিভ যেন জড়বস্তু।

এমন সময় আসরে শোরগোল উঠল, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কনে আসছে। পুরোহিত একটু বিরস বদনে বললেন, এবার যান, স্ত্রী-আচার করে আসুন।

সংস্কৃত সম্পর্কীয় আলোচনায় মনটা নরম হয়ে আসছিল, কিন্তু চার যোয়ান-বাহিত বেনারসী এবং হীরে-জহরতে মোড়া কনে শাঁখ, হুলুধ্বনি, তীব্র সানাইয়ের আওয়াজ ও কোলাহল সঙ্গে নিয়ে আসরে ঢুকতেই আবার বিগড়ে গেল সায়নের মনটা। জীবনের একটা পর্যায় শেষ হয়ে গেল, শেষ হলো একক জীবনের স্বাধীনতা, শেষ হলো ভারহীন দায়-দায়িত্বহীন জীবন। একজন উটকো মানুষ এসে তার অভ্যস্ত জীবনে ঘটাতে চলল ওলট-পালট।

শুভদৃষ্টির সময় ভয়ে পা কাঁপছিল সায়নের। চারদিক থেকে এত আলো, এত ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, এত চেঁচামেচির একটা অস্থিরতা তৈরি হলো যে, নববধূ বা সে কেউই চোখ তুলতে পারল না। তিতিরকে হয়তো বা তাকাতে হয়েছিল, সায়ন তাকায়নি।

সেই থেকে এই অবধি তিতিরকে দেখেইনি সায়ন। দেখবার ইচ্ছেটাই যেন জোর পাচ্ছে না। হয়তো বা সুন্দরীও হবে, সেরকমই শুনেছে সে। কুচ্ছিত হলেই বা কি? সুন্দর বা কুচ্ছিত কিছুতেই তার কিছু যায় আসে না।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বর-বউ পাশাপাশি খেতে বসেছে দরদালানে। চারদিক ঘিরে আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। মোটাসোটা ফর্সা এক-গা সোনায় মোড়া শাশুড়ী ঠাকরুন নিজের হাতে পরিবেশন করতে করতে বললেন, বাবা, আমার মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো!

সায়ন নত মাথাটা আরও একটু নামাল মাত্র।

শাশুড়ী বললেন, তুমি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী মানুষ বলে শুনেছি। বিয়ের আগে মেয়ের ছবিটাও দেখনি। তাই মনটা বড় অস্থির লাগে। কি জানি ওকে যদি তোমার পছন্দ না হয়!

সায়ন কাঠ হয়ে রইল অস্বস্তিতে। তার সামনে রুপোর থালা ঘিরে অজস্র রুপোর বাটি। কত ব্যঞ্জন! সে খেতে পারছে না। বিয়ের এত জাঁক তার ভাল লাগছে না। শুকিয়ে আছে তার ভিতরটা। ভয় হচ্ছে। উৎকণ্ঠা বাড়ছে।

বাসর রাত্রিটি কাটল আরও অস্বস্তিতে। বর-বউকে ঘিরে অজস্র যুবতী কিশোরী আর বালিকার ভিড়। হাসি, ঠাট্টা ইত্যাদি এমনিতেই সায়ন তেমন পছন্দ করে না। তার ওপর যদি তা আবার আদিরস-ঘেঁষা হয় তাহলে তার আরও বিপদ। তাকে বাঁচিয়ে দিল গান। বাসর রাতের এ বোধহয় অপরিহার্য অঙ্গ।

সায়ন গান জানে। মোটামুটি সুকণ্ঠ বলে তার খ্যাতি আছে। কলেজের নানা অনুষ্ঠানে সে অপরিহার্য গায়ক। কথাটা এ বাড়িতেও চাউর হয়ে গিয়ে থাকবে। গানের জন্য ঝোলাঝুলি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু গাইবে কি, তার ভিতরটা এমন কাঠ হয়ে আছে, গলা এত বিশুষ্ক যে, স্বর বের করাই

কঠিন। তার ওপর মেজাজ নেই। কিন্তু তা বলে মহিলারা ছাড়বে কেন ? হারমোনিয়াম এল, তবলা-ডুগি, তানপুরা অবধি চলে এল। এল তবলচি। বরের লজ্জা ভাঙার জন্য কয়েকজন আগে গাইল। তারপর সায়ন।

শেষ অবধি গানে গানেই কেটে গেল বাসর রাত, গানের জন্যই তেমন খারাপ কাটল না।

আজ ফুলশয্যার সেই ভয়াবহ রাত। সে আর তিতির একঘরে মুখোমুখি। রাত গভীর হচ্ছে। তিতির কি কিছু প্রত্যাশা করছে ? ওর কি বুক কাঁপছে শিহরনে ? নতুন বিয়ের বউয়ের তো ওরকমই হওয়ার কথা।

আজ সারা সন্ধ্যা সানাই বেজেছে। সানাই এক করুণ সুরের যন্ত্র। যেভাবেই বাজানো যাক, সানাই থেকে বিষাদ কখনও যায় না। কেন যে বিয়েতে সানাই বাজে কে জানে। বারবার বুকের মধ্যে হু-হু করে বয়ে গেছে সানাইয়ের তরঙ্গ। অতিথি অভ্যাগত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে তাকে। দুচারজনকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়েছে তিতিরের সঙ্গেও। অবশ্য খুবই দায়সারাভাবে দায়টা সেরেছে সে।

শুধু একটাই প্লাস পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছে সে এ বিয়েতে। তার বাবার মুখ উজ্জ্বল, রোগে পাণ্ডুরতা আর নেই। মায়ের মুখে-চোখে উপচে পড়ছে একটা অদ্ভুত আনন্দ।

সায়ন জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসল। পালঙ্কের ওপর জবুথবু ও স্থির হয়ে বসে আছে তিতির, যার মুখটাও সে ভাল করে দেখেনি।

চতুষ্পাঠীতে পড়ার সময় সায়ন রীতিমতো ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করত। ধুতি উত্তরীয় পরে থাকত। তার একটা ইচ্ছে ছিল, ইনজিনিয়ারিং পাশ করে সে অধ্যাপনার চাকরি নেবে আর একটা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করবে। মা-বাবা গত হলে সন্ন্যাস

নেওয়ার একটা আবছা ইচ্ছেও তার ছিল। কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল!

সায়ন আনমনে ডান হাতের অনামিকায় দ্যুতিময় হীরের আংটিটির দিকে চেয়েছিল। তার ঠাকুমা এখনও বেঁচে। হরিদ্বারে থাকেন। এই আংটি তিনি সায়নের জন্যই রেখেছেন। বিয়ের সময় সায়নকে যেন পরানো হয় একথা বারবার বলে রেখেছেন মাকে। ঠাকুমার বয়স এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। শয্যাশায়ী। ঠাকুমার কথা, গত মাঘ মাসে হরিদ্বারে যাওয়ার কথা মনে পড়েছে তার। হরিদ্বার ছাড়লেই গভীর হিমালয়, দেবভূমি। মনশ্চক্ষে তীর্থযাত্রার পথটি দেখতে পাচ্ছে সে।

গয়নার সামান্য শব্দ হলো। বেনারসীর খস্‌খস্‌। তারপর খুব ক্ষীণ একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপনি খাটে এসে ঘুমোন। আমি একটা মাদুর পেতে নিচ্ছি নিচে।

এ কথায় ভীষণ অবাক হলো সায়ন, তাই তো! এভাবে বসে বসে তো রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে না।

গলাখাঁকারি দিয়ে সায়ন বলল, তা কেন? তুমি যেমন আছো থাকো। পালঙ্কে তুমিই শোবে। আমি অন্য ব্যবস্থা করে নেবো।

তা হয় না। বলে তিতির সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল। গয়নার ভারে মেয়েটা যেন নুয়ে পড়ছে। ঘোমটায় মুখখানা আর সম্পূর্ণ ঢাকা নয়, তবে চন্দন রূপটান, চেন লাগানো নাকছাবি, টিকলি ইত্যাদিতে সে মুখখানা এখন মুখোশের মতোই মিথ্যে। সেই মিথ্যে মুখখানার দিকে এই প্রথম তাকাল সায়ন। সুন্দর না কুৎসিত সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু মুখ তথা মুখোশ ভেদ করে যেটা সায়নকে প্রথম চমকে দিল তা হলো কাঠিন্য। মুখে কোনও বিগলিত বা ভীত ভাব নেই। খুব একটা লজ্জাও নয়। এতক্ষণ যে জবুথবু ভাবটা ছিল সেটা কোথায় উবে গেছে।

সায়ন আবার গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, আমার ঘুম পাচ্ছে না। আমি রোজ অনেক রাত অবধি জেগে পড়াশুনো করি। তুমি বরং ওখানে শুয়ে পড়ো। আমি একটু বইপত্র নাড়াচাড়া করি।

হঠাৎ তিতিরের গলা একটু তীক্ষ্ণ শোনাল, রোজই তাই করবেন? সারা বছর?

না, তা কেন? আমার এখন এমনিই—তেমন ঘুম আসছে না—তাই।

রাত কিন্তু অনেক হয়েছে।

জানি।

দুজনেই একটু চুপ করে গেল। তাদের প্রথম আলাপটাই এমন বেসুরে বাজল যে, সায়ন মনে মনে বিরক্তি আর রাগ বোধ করছিল।

কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে তিতির। বোধহয় এরপর কী করা উচিত তা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সায়ন ওর দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, তোমার তো এই বিয়েতে ইচ্ছে ছিল না শুনেছি, তাহলে করলে কেন?

তিতির তার ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, ইচ্ছে তো আপনারও ছিল না।

হ্যাঁ। আমাকে রাজী হতে হলো বাবার অসুখের জন্য। মা-বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ার মাশুল। তুমি-রাজী হলে কেন?

তিতির একটু বোধহয় মাথা নাড়ল। তারপর বলল, মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কে দাম দেবে? মেয়েরা এখনও কমোডিটি, এখনও লাইভস্টক।

সায়ন তিতিরের মুখে এরকম স্পষ্ট কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। নিজের প্রতি একটা ধিক্কার আসতে লাগল তার। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কি করা যায় বলো তো!

তার মানে?

তার মানে, তোমার যখন এটা অনিচ্ছের বিয়ে তখন—

তখন ?

আমাদের বোধহয় এটা মেনে নেওয়া উচিত নয়।

তিতিরের গলায় কি একটু ব্যঙ্গ ফুটল, তাহলে কি সেপারেশন চান ?

সেপারেশন ! বলে ঠাণ্ডা মেরে গেল সায়ন। এ কার সঙ্গে তার বিয়ে হলো ! ষোলো বছর বয়স মাত্র, কিন্তু এ তো সাংঘাতিক তেজী ধরনের মেয়ে ! ফুলশয্যার রাতেই ওর মাথায় সেপারেশন কথাটা আসে কি করে ? সায়ন চটপট জবাব দিল না। একটু ভেবে বলল, না, আমি অতটা ভাবিনি।

তিতির ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ় গলায় বলে, চাইলে পেতে পারেন। আর তো কোনও পথ নেই ।

সায়ন হীরেটার দিকে চেয়ে থাকে। তার রাগ হচ্ছে। এই ডেঁপো মেয়েটাকে সে সহ্য করতে পারছে না। মা-বাবার নির্বাচন বোধহয় খুবই ভুল। সায়ন রোখাচোখা ছেলে নয়। জন্মেও সে কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ বা তর্কও করেনি। সে মুখচোরা লাজুক ধরনের ছেলে। হাজির-জবাব ব্যাপারটাও তার ভিতরে নেই।

সায়ন তবু রেগে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। রাগলে তার কথা হারিয়ে যায়। সে গুম হয়ে থাকে।

তিতির গয়নার শব্দ তুলে বাথরুমে গিয়ে দরজা দিল। জলের শব্দ।

সায়ন উঠে বারান্দার দরজা খুলে বেরিয়ে এল। এ বাড়িতে সর্বত্র এবং যত্রতত্র আজ অনেক মানুষ শুয়ে আছে। অনেকের বিছানাই জোটেনি। শুধু এ বারান্দাটা ফাঁকা, বোধহয় বর-বউয়ের নিভৃতি রক্ষার জন্যই কাউকে শুতে দেওয়া হয়নি। সায়ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। মাথাটা সামান্য তপ্ত। আর কেন যে হঠাৎ এত একা লাগছে।

বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে সিঁড়ি। সায়ন বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নমাল। তার মামাতো ভাই নসু তার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। নসু যে এ রাতে কোথায় শোওয়ার জায়গা পেয়েছে তা বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু নসুকেই এখন তার দরকার। যত অন্তরঙ্গ গোপন কথা সব যে নসুকেই বলে।

খুঁজতে খুঁজতে নসুকে আকস্মিকভাবে সে পেয়ে গেল ছাদে।

ছাদে আজ প্যাণ্ডেল হয়েছে। চারদিক ঢাকা। আলোগুলো এখনও জ্বলছে এবং জায়গাটায় এখনও পোলাও মাংসের গন্ধ থম ধরে ররেছে। এখানে সেখানে চট বা শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে আছে নানা লোক।

নসুকে পাওয়া গেল জলের ড্রামের পাশে, চটের ওপর হা-ক্লান্ত পড়ে মোষের মতো ঘুমোচ্ছে।

চেঁচিয়ে ডাকলে পাছে অন্যদের ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে নসুকে ধাক্কা দিয়ে তুলে ফেলে সায়ন।

নসু জেগে সভয়ে তার দিকে চেয়ে বলে, কি রে? তুই এখানে কেন?

চলে এলাম। বলে চটের একধারে বসে পড়ে সায়ন।

নসুর ঘুমের জের এখনও কাটেনি। ভাল বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। সারাদিন অসুরের মতো খেটেছে বিয়ের খাটুনি। এখনও তার মাথার মধ্যে ঘুমের পাহাড় চেপে আছে, বুদ্ধি-বিবেচনা কাজ করছে না। একটা হাই তুলে বলে, এখনও সকাল হয়নি তো! তুই চলে এলি কেন?

ফুলপ্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা নসুর চেহারাটা খুবই ভাল। ব্যায়াম করে। ব্যায়ামবীর হিসেবে ইদানীং একটা চাকরিও পেয়েছে রেলে। চাকরি পাওয়ার আগে অবধি নসুর জীবন নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যের ইতিহাস। নসু অ্যাডভেঞ্চারাস বলে একসময়ে রিকশা চালিয়েছে, খবরের কাগজ ফিরি করেছে, বাস কন্ডাকটরি

করেছে, লটারির টিকিট বিক্রি করেছে, আর এইভাবেই মাথার ওপর দায়দায়িত্ব নিয়ে বি-এ পাশও করে গেছে। ব্যায়ামবীরের খিদে মেটানোর সাধ্য ছিল না ওর বিধবা মায়ের। নসুর সেইসব খিদের দিনে সায়নের মা ওর খিদে মেটাতেন। নসু প্রতিদিন রাতে এবং কখনও কখনও দিনের বেলাতেও এসে এ বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়ে যেত! সেই থেকে সায়নের সঙ্গে ওর একটা গভীর ভালবাসা হয়। নসুর দারিদ্র্য সাংঘাতিক হলেও মুখের হাসি ছিল অমলিন। দুটো বোনের বিয়ে, একটা নাবালক ভাইকে গড়ে তোলা মাত্র তেইশ বছর বয়সে সামলে ওঠা এক মস্ত যুদ্ধজয়ের মতো।

নসু চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসে পাশে বসে বলে, রাত মোটে একটা বাজে, কী হলো তোর বল তো! নতুন বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিসনি!

সায়ন হাসবার চেষ্টা করে বলে, আলাপ হয়েছে।

তাহলে?

তাহলে কি?

চলে এলি যে! বিয়ের রাত মানে তো দারুণ রোমান্টিক ব্যাপার।

ধুস।

নসু সন্দেহ-কুটিল চোখে তাকে একটু জরিপ করে নিয়ে বলে, এখনও সেই পাগলামি চলছে?

কিসের পাগলামি?

অ্যান্টি ম্যারেজ ফিলসফি!

বিয়ে ব্যাপারটা কেমন বল তো! একটা সাজানো ব্যাপার নয়?

কোথা থেকে একটা গামছা টেনে বের করে নসু মুখের জল এবং ঘাড়ের ঘাম মুছে বলে, দুনিয়াটাই সাজের খেলা। সিভিলাইজেশন মানেই তো আদিম ব্যাপারকে পোশাক দিয়ে, রংচং দিয়ে ঢাকা।

ওটা কোনও প্রবলেম নয়। বল তো ব্যাপারটা কি ?

মেয়েটাকে আমার ভাল লাগছে না।

সে কি ? বলে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নসু বলে, ভাল না লাগার মতো মেয়ে তো নয়।

তাহলে কেমন মেয়ে ?

সোবার। ডীপ ফিলিং আছে !

তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

হবে না কেন ? তুইই তো পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলি।

পাত্রী দেখা তো বাইরের ব্যাপার। তা থেকে কি কিছু বোঝা যায় ?

তুই কি বুঝলি সেটা বল তো ?

সায়ন খানিকক্ষণ সময় নিয়ে বলে, বুঝবার মতো অবস্থা এখনও হয়নি। জাস্ট প্রথম আলাপেই মনে হচ্ছে মেয়েটা বড্ড রোখাচোখা। আপস্টার্ট, ঠোঁটকাটা।

সে কী ! বলে চোখ বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করে নসু। মাথা নেড়ে বলে, এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

আমাকে মেয়েটা পছন্দও করছে না।

কি করে বুঝলি ? এই তো সবে আলাপ হলো তোদের, এত তাড়াতাড়ি কী হলো বল তো !

দু-চারটে কথা। তাতেই বেশ ইনসাল্ট ফিল করছি।

নসু মাথা নেড়ে অসহায় ভাব প্রকাশ করে বলে, আমি তো একা নই, পিসেমশাই-পিসিমা, তোর জ্যাঠামশাই আর কাকা সবাই দেখেছে। কেউ তো মেয়েটাকে খারাপ বলেনি।

আমিও ভাল-খারাপ কিছু বলছি না।

তাহলে কী বলছিস ?

বিয়েটাই ভুল। রং ম্যারেজ।

বড্ড কম সময়ে বড় বেশী বুঝে ফেলেছিস। ঠিক আছে, চল, আমি তিতিরের সঙ্গে কথা বলব।

সেটা খুব নাটুকে হয়ে যাবে। মেয়েটা ভাববে আমি এঁটে উঠতে না পেরে হেলপার ডেকে এনেছি।

উঠবার উপক্রম করেও ফের বসে পড়ে নসু বলে, তাও বটে। আজ ফুলশয্যার রাতেই মিডলম্যান বা কাউনসেলার হাজির হলে তোর পক্ষে ডিসক্রেডিট।

ওর পক্ষেও। আমার ইকুয়াল পার্টনার।

হ্যাঁ, তাও বটে। তাহলে কী করা যায় ?

আপাতত কিছু করার নেই, আমি তোর সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে রাতটা কাটাতে চাই।

নসু সবিস্ময়ে বলে, আর তিতির একা থাকবে ?

আমি ওঘরে থাকলে বোধহয় আমাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যাবে। আমি ওর মধ্যে নেই। ঝগড়া আমি করতেই জানি না।

নসু তার দিকে চেয়ে বলে, ঝগড়া করিস না বটে, কিন্তু তুই মাঝে মাঝে খুব রেগে যাস। আর যত রেগে যাস তত চুপ মেরে যেতে থাকিস।

সায়ন একটু হাসল।

নসু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, এটা কিন্তু ভাল নয়। রাগ হলে বরং আউটবার্স্ট একরকম ভাল। যারা চুপ মেরে যায় তাদের নিয়েই বিপদ।

আমি চেঁচামেচি করতে পারি না। ওটা আমার ড্রব্যাক।

তোর সাইকিয়াট্রিস্ট কাকা কি বলেছে জানিস ? বলেছে, সায়নটা বড্ড চুপচাপ থাকে। শান্ত মানুষের রাগ সাংঘাতিক। ওরা খুন অবধি করে ফেলতে পারে।

সায়ন এবারও হাসল, তবে হাসিটা বিবর্ণ।

রাগ করার মতো তিতির তোকে কী বলেছে ?

সায়ন একটা শ্বাস ফেলে বলে, যা বলেছে তা না মাইণ্ড করলেও চলে। আমি এক বিছানায় শুতে চাইনি বলে বলছিল, সারাজীবনই কি এভাবে বসে কাটাবেন ?

দোষ তো তোর। শুতে চাসনি কেন ?

ও-ও চায়নি। আমরা পরস্পরকে রিজেক্ট করে দিয়েছি।

খুব বীরত্বের কিছু দেখাতে গিয়েছিল নাকি ওকে ?

তুই একটা গাধা। বীরত্ব দেখানোর কী আছে ?

তবে লাগলটা কি নিয়ে ?

লাগেনি। কথার পিঠে কথা। মেয়েটা বেশ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে পারে। ফস করে বলে বসল সেপারেশন চাইছি কিনা।

সেপারেশন ?

হ্যাঁ, সেপারেশন।

আর সেইটেই তোর সেন্টুতে লাগল বোধহয়।

সেপারেশনের কথাটা উচ্চারণ করা মানেই তো বেয়াদবি।

দ্যাখ, আমি তোকে খুব ভাল চিনি। তুই একটু গেঁড়ে গোঁয়ার আছিস। নিশ্চয়ই তুই মেয়েটাকে খুঁচিয়েছিলি, নইলে ওরকম বলার মেয়েই নয়।

তুই আন্দাজে-মান্দাজে ওকে সাপোর্ট করে যাচ্ছিস কেন ? তুই ওর কতটুকু জানিস ?

ওকে জানি না। তোকে জানি। তোর স্বভাব হলো জল ঘোলা করে খাওয়া। বিয়ে নিয়েই কম নাকাল করেছিল পিসেমশাইকে ?

নাকাল করলাম আবার কবে ?

লোকটা তোর জন্যই দু-দুবার শক্ত অসুখে পড়ে গিয়েছিল। এখন যা করছিস তা শুনলে পিসেমশাইয়ের স্ট্রোক হবে।

সায়ন গম্ভীর হয়ে বলে, আমি কিছু করিনি। ইনিসিয়েটিভটা আমার ছিল না।

নসু মুখে যা-ই বলুক, সে সায়নকে আদ্যন্ত ভালবাসে।

তাদের সম্পর্কটা আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের চেয়েও বুঝি কিছু গভীর। নসু কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলে, দাঁড়া, একটু চা খাওয়া যাক।

এত রাতে চা? তুই তো খাস না।

চা আমি খাই না বটে, কিন্তু এখন খেতে ইচ্ছে করছে। নিচের দরদালানে একটা বন্দোবস্ত আছে দেখেছি।

নসু চলে গেল এবং মিনিট দশেক চুপচাপ শূন্য মনে বসে রইল সায়ন। বড় ভুল হয়ে গেল। মস্ত ভুল। সারাজীবন এই ভুলের মাশুল তাকে দিতে হবে, তার পুরো পরিবারকে দিতে হবে।

নসু দু কাপ চা হাতে উঠে এসে বলল, তোর বউ দোতলার বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে আছে।

থাকগে।

আমি উঁকি মেরে দেখেই চলে এসেছি। দেখতে পায়নি। আমি বলি কি, চা খেয়ে আর একবার যা। আমাদের অ্যাসেসমেন্টে অনেক ভুল থাকে। এখনও হোল নাইট পড়ে আছে, কথা বলে দেখ না। এমনও হতে পারে যে, কথা বললে তোর হয়তো ভালও লেগে যেতে পারে মেয়েটিকে।

আমি অত সহজে নরম হওয়ার মানুষ নই। ও প্রথম থেকেই ঠেস দিয়ে কথা বলছে কেন? এমনিতেই এই বিয়ে নিয়ে আমার আপত্তি ছিল, তার ওপর মেয়েটাও যেন কেমন।

ঠিক আছে। মাথা ঠাণ্ডা করে আগে চা খা।

চা খেতে সায়নের বেশ ভাল লাগছিল। খাতায় কলমে বসন্ত-কাল হলেও এখন গরম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এই মধ্য-রাত্রিটি শান্ত ও শীতল। একটাই রাত, কারও আনন্দে কাটছে, কারও দুঃখে বা শোকে বা রাগে। যার যেমন ভাগ্য বা কর্ম।

আমি একটা কথা ভাবছি। চায়ের কাপটা রেখে নসু বলল।

সায়ন উৎসাহ দেখাল না। চা শেষ করে কাপটা সরিয়ে রেখে বলে, একটু শুতে দে। ঘুম পাচ্ছে।

ওরে, ওরকম করিস না। ঠিক আছে, আর একবার ট্রাই কর। মাত্র একবার। তারপর যা বলবি মেনে নেবো। খুব খারাপ দেখাবে রে। চারদিকে কথা উঠবে। মেলামেশা না করিস, কথা না বলিস অন্তত ঘরে যা। চেয়ারে বসেই না হয় রাতটা কাটিয়ে দিবি। পিসেমশাই-পিসীমার মুখ চেয়ে, তাদের মানমর্যাদার কথা ভেবে এটুকু করতে পারবি না?

এখন পারব না। মাথাটা গরম হয়ে আছে।

তোর তো মাথা গরমেরই ধাত। পয়সাওলা ঘরের একমাত্র সন্তান তো, তাই তুই যেন কেমন একটা উগ্র মেজাজের ছেলে হয়েছিস। হতি যদি আমার মতো তাহলে বুঝতি কত কিছু সামলে চলতে হয়। যাদের মাথা হুট করে গরম হয়ে ওঠে দুনিয়াটা তাদের কাছেই বেশী গোলমেলে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে দেখ, সব ঠিক আছে।

খুব বাণী দিচ্ছিস আজ!

বাণীর মতো শোনাচ্ছে নাকি? তুই একটা গাড়ল।

সায়ন মাথার নিচে হাত রেখে চটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে বলে, ঘটনাটার জন্য মা-বাবা তোরা সবাই দায়ী। আমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। শোন, আমি কালই হোস্টেলে পালাবো। ওই অষ্টমঙ্গলা-ফঙ্গলায় যেতে পারবো না। আমার জরুরী পড়া আছে। কথাটা মা আর বাবাকে বুঝিয়ে বলিস। সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা।

নসু অবাক হয়ে বলে, অষ্টমঙ্গলায় যাবি না? তুই তো বড্ড বাড়াবাড়ি লাগিয়ে দিলি দেখছি। চারদিকে ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে যে!

পড়ুকগে। বলে সায়ন চোখ বুজে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগল।

শোন, ওরে পাগল, শোন।

কী শোনাবি ? ফের বাণী ?

না। বলছিলাম কি, মেয়েটারও তো বিয়েতে ইচ্ছে ছিল না। ওকেও তো জোর করে রাজী করানো হয়েছে। এবার ওর দিকটা ভেবে দেখ তো ! তুই তো দিব্যি নিজের ফ্যামিলিতে নিজের মতো করে থাকবি, কিন্তু ওই মেয়েটা! ওর তো এটা অচেনা বাড়ি, অচেনা মানুষজন, ভিন্ন পরিবেশ। ও তো একটু সিমপ্যাথী এক্সপেক্ট করতেই পারে। তুই যদি এরকম করিস তাহলে মেয়েটার মনের অবস্থা কী হবে বল তো !

ও মেয়ে অত কাঁচা নয়। বয়স কম হতে পারে, কিন্তু পাকা মাণ্ডু।

তুই ঠিক বুঝতে চাইছিস না সায়ন। ভদ্রতা সভ্যতা বলেও কিন্তু একটা জিনিস আছে। এত অল্প সময়ে এত কিছু ঘটতে পারে না যাতে তুই এতটা রিজিড হয়ে যাচ্ছিস। তোকে আমি এখানে শুতে দেবো না, কাতুকুতু দিয়ে তুলে দেবো।

এ বাড়িতে আরও জায়গা আছে।

বেশী বাড়াবাড়ি করবি তো পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে গিয়ে তিতিরের সামনে ফেলে দিয়ে আসবো।

উঃ, জ্বালিয়ে খেলি তো !

তুই ঘরে যা সায়ন। ফুলশয্যার রাতে এরকম করতে নেই। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল এনে দিচ্ছি, খা। খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর।

ঠাণ্ডা জলের কেস হলে কখন ঠাণ্ডা জল খেতাম। ঠিক আছে, তোর কথাই থাক। যাচ্ছি।

সায়ন উঠল।

নসু একগাল হেসে বলে, দ্যাটস দা স্পোর্টসম্যান স্পিরিট। যা, মাথা ঠাণ্ডা করে বউয়ের মুখের দিকে একটু চেয়ে থাক। তিন মিনিটে মেজাজ শরিফ হয়ে যাবে।

বাচ্চুর ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। প্রতিদিন ভাঙে। কোনোদিনই সে একটানা গাঢ় ঘুমে ঘুমোতে পারে না। প্রতি রাতে তাকে ট্রাংকুইলাইজার খেতেই হয়। ঘুম—স্বাভাবিক সুন্দর ঘুম তার শরীর থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে কিনা তা বলতে পারবে না বাচ্চু। তবে ঘুমহীনতার পাগলা অস্বস্তি সারাদিন তাকে তাড়া করে। রাত যত গাঢ় হয়, ঘুমের সময় যত এগিয়ে আসে, আজকাল ততই ভয় বাড়ে।

সাতাশ বছরের টগবগে একজন যুবতীর পক্ষে এটা একটা অভিশাপ।

তাদের পুরোনো বাড়িটা ভেঙে প্রোমোটার মস্ত ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়েছে। দশতলা বিশাল বাড়ি। তাদের তিন ভাই বোন

প্রত্যেকে এবং মা-বাবা একসঙ্গে একটা করে ফ্ল্যাট পেয়েছে। প্রায় বারো শ' স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাট এবং কিছু নগদ টাকাও। নিজের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকবে বলেই বাচ্চু ফ্ল্যাট নিল দশতলায়, সবার ওপরে। ভাই আর দিদিব ফ্ল্যাট তিনতলায়, মা-বাবার দোতলায়। বাস্তবিক তার যোগাযোগও নেই ওদের সঙ্গে। দিনের পর দিন দেখাও হয় না।

এই ফ্ল্যাটে সাতাশ বছরের বাচ্চু একা। সম্পূর্ণ একা। ফ্ল্যাটটা তার একার পক্ষে বড্ড বড়। প্রোমোটার প্ল্যান অনুযায়ী তিনটে শোওয়ার ঘর করে দিতে চেয়েছিল। বাচ্চু একটা শোওয়ার ঘর রেখে বাকি ফ্ল্যাটটা মস্ত হলঘরের মতো ফাঁকা রেখেছে। ঘরের দরকার তো তার নেই।

মণীশের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেছে তিন বছর আগে। তাদের তিন বছরের বিবাহিত জীবনে কোনও সন্তান হয়নি। মণীশ চেয়েছিল, ভাগ্যিস বাচ্চু চায়নি। মণীশের স্মৃতিবহনকারী সব কিছুই বাচ্চু বিদায় করে দিয়েছে। সন্তান হলে সেটাকে পারত না! তাই বাচ্চু এখন নিজের সিদ্ধান্তে খুশি হয়। তার খুশির আরও অনেক কারণ আছে। সে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন, দায়হীন। নিত্য তাকে কোনও মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয় না।

শুধু বাবা আর মা, তাদের সঙ্গে একটু লেগে যায় বাচ্চুর' তাই দশতলায় উঠে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সে লিফটে উঠে আসে, লিফটে নেমে যায়। মা বাবার মুখোমুখি হয় না।

বাচ্চু চাকরি করে একটা স্কুলে। সহকারী প্রধান শিক্ষিকা। মাইনে যা পায় তাতে তার দেদার হয়ে যায়। সে পোশাক-আসাকে শৌখিন নয়, রূপটান ব্যবহার করে না, বাজে খরচের ঝোঁক নেই। সে পড়াতে ভালবাসে। তার চেয়েও বেশি বাসে মেয়েদের মধ্যে স্বাধীন চিত্তবৃত্তির বীজ বপন করে দিতে। মেয়েরা সেই

আবহমানকাল থেকে যে জোয়াল বয়ে আসছে সেই জোয়ালটিকে অস্বীকার করার সময় এসে গেছে অনেক দিন। তার নিজের জীবনই তার দৃষ্টান্ত।

ক্লাস টেন-এর, একটি ফ্রক-পরা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল দুদিন মাত্র আগে। বাচ্চুর খুব প্রিয় ছাত্রী ছিল মেয়েটি। পড়াশুনোয় ভাল বলে নয়, মেয়েটি ছিল তার প্রিয় পাত্রী। একেবারে ছোটো ক্লাস থেকে পড়ছে তার কাছে! কিছুদিন মেয়েটিকে প্রাইভেট পড়াচ্ছিল বাচ্চু। সেই স্বাধীনচেতা ফুটফুটে চমৎকার মেয়েটিকে কেন যে বিয়ের লাগামে বেঁধে সংসারের ছ্যাকরা গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হলো তা আজ বাচ্চুর কাছে এক জ্বলন্ত প্রশ্ন। সে দ্বিধাহীনভাবে মেয়েটির বাবাকে বলেছিল, আপনার জেল হতে পারে তা জানেন?

মেয়েটির বাবা একটু থতমত খেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জড়তাহীন গলায় বলেছিল, তা খাটবো না হয় জেল। তবে আমার যা ইচ্ছে হয় তাই বরাবর করেছি।

লোকটা ভয়ঙ্কর বড়লোক। পুরোনো আমলের পড়তি জমিদারির পতন সামলে ব্যবসা করে এখন উঠতি বড়লোক। টাকার জোর আছে। পেয়াদার জোরও আছে। কিন্তু বাচ্চু ভয় খায়নি। বলেছিল, আপনি যদি তিতিরের সর্বনাশ করতে চান তাহলে আমিও আপনাকে ছেড়ে দেবো না। তিতির মাইনর বলেই যে আপনি যা-খুশি করতে পারেন তা ভাববেন না যেন। মেয়ে বা বউ আপনার ক্রীতদাসী বা গৃহপালিত জন্তু নয় যে, তাদের ইচ্ছেমতো চালাবেন।

এ কথায় ভদ্রলোকের ফর্সা মুখ এত লাল হয়ে গেল যে, স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না বাচ্চু।

ভদ্রলোক অবশ্য সামলে উঠে বললেন, মেয়েদের যথার্থ বিয়ের বয়স কোনটা তা নির্ধারণ করবে কে? আমি আইন জানি, কিন্তু

মানি না। আর যে মেয়ে আমার স্নেহে ভালবাসায় বড় হয়েছে, যাকে আমরা বুকে করে বড় করেছি তার কল্যাণ আমরা চাইব না, আপনি চাইবেন, এ বড় অদ্ভুত কথা।

আপনারা অন্ধ বলে বুঝতে পারছেন না। চক্ষুষ্মান হলে বুঝতেন যে, কল্যাণ নয়, আপনি তিতিরের সর্বনাশই করছেন। ও ভাল ছাত্রী, স্পোর্টসে ভাল, ওর সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। শ্বশুরবাড়ি ওকে নষ্ট করবে, আটক করে রাখবে, বড় হতে দেবে না।

শ্বশুরবাড়ির অনেক দোষ, না?

অনেক দোষ। যে কোনও মেয়ের কাছেই শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে কবর।

সকলের অভিজ্ঞতাই কি এক?

আপনি আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন। অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা, অনেক ভোগসুখ দিলেই বুঝি মেয়েদের সব পূরণ করা যায়? তাদের স্বাধীনতার দাম কিন্তু অত কম নয়।

ভদ্রলোক ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বললেন, আমার স্ত্রী কি কখনও আপনার কাছে এ রকম কোনও কথা বলেছেন?

না। বলার দরকার হয় না। আমিও মেয়ে, মেয়ে বলেই আর একজন মহিলার দুঃখ বুঝতে পারি।

উনি বিশ বছরের ওপর আমার ঘর করছেন। কখনও ওকে আনহ্যাপী মনে হয়নি। তবে আমি পুরুষ, আমার বুঝবার ভুল হতেই পারে। কিন্তু মাপ করবেন, আপনার সামনে অর্থাৎ কোনও তৃতীয় পক্ষের সামনে আমরা এ ব্যাপারে বোঝাপড়া করতে চাই না।

বাচ্চু হিতাহিত বিস্মৃত হয়ে বলে, আমি ওঁকেও বোঝাবো, মেয়ের বিয়ে দিয়ে উনি কত বড় ভুল করছেন।

বেশ তো, এ বাড়ির অন্দরমহল তো আপনার অপরিচিত নয়। আপনি স্বচ্ছন্দে ওঁর কাছে যেতে পারেন।

তাই গিয়েছিল বাচ্চু।

মেয়ের মা তাঁর স্বামীর মতো নন। বাচ্চুর কথা শুনে কেঁদে কেটে বলেন, আমিও তো এই বয়সে মেয়ে বিদেয় করতে চাইনি। কিন্তু পাত্র যে বড় ভাল। এরকম যদি আর পাওয়া না যায়।

এরকম পাত্র আর পাওয়া যাবে না এমন ভাবছেন কেন ? হয়তো এর চেয়ে ভালই পাওয়া যাবে। ছেলেটি তো শুনেছি এখনও ছাত্র।

হ্যাঁ। ইনজিনিয়ারিং-এর শেষ বছর।

তাহলে ? এমন কি ভাল পাত্র ?

ভদ্রমহিলা খুব অসহায়ভাবে বলেন, আমি মেয়েমানুষ, বাইরের জগতের কতটুকু খবর রাখি বলুন। তবে শুনেছি পাত্র সচ্চরিত্র, মেধাবী ছাত্র। কিন্তু বিয়ে তো সেজন্য হচ্ছে না। ছেলের বাবার খুব অসুখ, বাঁচেন কি মরেন ঠিক নেই, সেজন্যই তাড়াহুড়ো করে বিয়ে।

বাচ্চু ভিতরে ভিতরে রেগে গেলেও তা গলায় উঠে আসতে দিল না। রেগে লাভ নেই। এদের বোঝাতে হবে, সচেতন করে দিতে হবে। বোধহয় কয়েক হাজার বছর ধরে এইসব মেয়েমানুষেরা পুরুষের মতে মত দিয়ে আসছে। কালপ্রাচীন নিরেট এই প্রথা ভাঙা সহজ কাজ নয়। ধৈর্য চাই, স্থৈর্য চাই, মাথা ঠাণ্ডা রেখে যুক্তি ও বিবেচনা এদের ভিতরে জাগিয়ে তোলা চাই। এমন কি ভদ্রমহিলার কথায় সে একটু মিষ্টি করে হাসলও। বলল, একজন লোকের অসুখ বলে তার ছেলের সঙ্গে আপনি আপনার নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন এটা কোনও স্বাভাবিক যুক্তি হলো ? ছেলেটা ভবিষ্যতে কী হবে, কেমন হবে, কিছুই না বুঝে ঝুঁকি নেবেন ? ঘর তো করবে আপনার মেয়ে, সব ঝক্কি পোয়াতে হবে তাকে, অথচ তার কোনও চয়েস বা বাছাবাছি থাকতে নেই ? তাছাড়া এটা ভীষণরকম বে-আইনী কাজ। আপনাদের জেলও হয়ে যেতে পারে কিন্তু।

ভদ্রমহিলা ভয় পেলেন, উৎকণ্ঠিত মুখে বললেন, জেল হবে ?

আইন সেরকমই। আপনি আপনাদের উকিলকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন।

কিন্তু মেয়ের বাবা তো সব জেনে বুঝেই করছেন। উনিও তো ওকালতি পাশ।

বাচ্চু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, উনি আইন ভালই জানেন। কিন্তু এ সমাজে আইন তাদের কিছুই করতে পারে না যাদের পয়সা আর প্রতিপত্তি আছে। তবে আমার একটা অর্গানাইজেশন আছে, তাতে মিনিস্টাররা ইনভলভ্ড। আমার অর্গানাইজেশন যদি মুভ করে তবে অ্যাকশন হবেই। কিন্তু ততদূর আমরা যেতে চাই না। তাই আপনার কাছে এসেছি। আপনার মেয়ে এ বিয়েতে রাজী নয়।

তিতিরের মা অপরাজিতা অজস্র চোখের জল ফেলছিলেন। এবার বললেন, সব জানি। আপনাকে তিতির খুব মানে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আপনার কাছেই আমার অনুরোধ, বিয়েটায় এখন আর বাধা দেবেন না, তাহলে আমাদের খুব অসম্মান হবে, মুখরক্ষা হবে না। তিতিরেরও তাতে ক্ষতি। একবার বিয়ে ভাঙলে ওর বিয়ে দেওয়া মুশকিল হবে।

বাচ্চু ধৈর্য ধরে বলল, ওর বিয়ের জন্য ভাবছেন কেন ? বিয়ে হলে হবে, না হলে না হবে। মেয়েদের নিয়ে যেভাবে বিকিকিনি হয় সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। তিতিরের হয়েই আমি লড়তে চাই।

শুনুন, আমাদের হয়তো একটা ভুলই হচ্ছে। কিন্তু আমার বিয়েও তো খুব কম বয়সে হয়েছিল। তখন আমারও তিতিরেরই বয়স। সব মানিয়ে তো গেছে। কিছুই তো তেমন খারাপ হয়নি। আপনি তিতিরকে আশীর্বাদ করুন, ওরও যাতে ভালই হয়।

আপনারা এ বিয়ে তবে দেবেনই ?

এখন আর পেছোনোর পথ নেই যে।

বাচ্চু সেদিনই থানায় গেল। অফিসার-ইন-চার্জ বাচ্চুর লিখিত অভিযোগটি ভাল করে পড়লেন, তারপর মাথা চুলকে বললেন, মাইনর মেয়ে বলছেন ? কিন্তু বয়স তো দেখছি ষোলো।

ষোলো মানে তো মাইনর ?

ও সি একটু সপ্রতিভ হাসি হেসে বলেন, খুব মাইনর কি একে বলে ?

আইন তাই বলছে।

শুনুন, ষোলো বছর কিন্তু একেবারে ফেলনা বয়স নয়। কদিন আগে একটা ম্যাগাজিনে দেখছিলাম, আমেরিকার চোদ্দ পনেরো ষোলো বছর বয়সের অনেক মেয়ে ছেলে-মেয়ের মা হয়েছে বা হচ্ছে। আমেরিকা তো খুব ব্যক্তিস্বাধীনতার দেশ। ওখানে এসব

ব্যাপার নিয়ে কড়াকড়ি নেই কেন বলুন তো !

আমেরিকার কথা বলতে পারব না, তবে এ দেশের আইনে যখন আটকায় তখন আপনাদের স্টেপ নিতেই হবে। নইলে আমি খবরের কাগজে, লালবাজারে আর উইমেনস অর্গানাইজেশনে জানাবো।

ও সি স্তিমিত গলায় বলেন, সবই তো বুঝতে পারছি, ইউ আর আউট ফর অ্যাকশন। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, একটা মাঙ্গলিক কাজে বাধা দিলে দু দুটো ফ্যামিলির সোশ্যাল প্রেস্টিজ কোথায় নেমে যাবে ! মেয়েটির ভবিষ্যৎই বা কী হবে ?

ভালই হবে। ভালর জন্যই তো এই চেষ্টা।

ও সি মাথা নেড়ে বলেন, আমার অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। বিয়েটা এভাবে রদ করা উচিত নয়। যোলো বছর নিয়ে আইন যাই বলুক, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য কথাই বলে। আমার ঠাকুমার সাত বছরে আর মায়ের বারো বছরে বিয়ে হয়, কিছু খারাপ হয়নি তাতে।

খারাপ ভালর ধারণাই আপনার নেই। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়া বা ক্যারিয়ার বলে কিছু ছিল না। বিয়েটাই ছিল একমাত্র ক্যারিয়ার। বিয়েতে তাদের কনসেন্ট অবধি নেওয়া হতো না। আপনি আপনার ঠাকুমা আর মাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন যে, তাঁরা জীবনে কোনও স্বাধীনতার স্বাদই পাননি।

ও সি মধ্যবয়সী, শান্ত মানুষ। উত্তেজিত না হয়ে বললেন, ঠাকুমা বা মা কেউই অসুখী ছিলেন না। এনিওয়ে, যুগ তো খানিকটা পাল্টেছে বটেই। আপনি অ্যাকশন চাইলে অ্যাকশন নিশ্চয়ই নেওয়া হবে। তবে হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউন্ডে।

বিয়েটা আটকানোই একমাত্র হিউম্যানিটারিয়ান কাজ হবে।

দেখছি। আমি এটা ফাইল করে দিচ্ছি।

বাচ্চু উঠল। প্রচ্ছন্ন একটা হুমকি দিয়ে বলল, আশা করি

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কিছু একটা হবে। নইলে কিন্তু আমার কোর্স অফ অ্যাকশন ঠিক্ত করাই আছে।

ও সি মৃদু হেসে বললেন, পুলিশের অনেক দোষ, তাই না? কিছু করলেও দোষ, না করলেও দোষ। ঠিক আছে, আমি আগে মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখি।

দয়া করে মেয়ের সঙ্গেও বলবেন। তার মতামতটাও জরুরী।

তাই হবে।

পুলিশ কিছুটা নাড়াঘাঁটা করেছিল ঠিকই। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি। পুলিশ যে তাদের বাড়িতে সামাজিকমূলক একটি সাক্ষাৎকারে গিয়েছিল তা তিতিরের কাছেই শুনেছে বাচ্চু। চা খেয়েছে, গল্পগুজব করেছে। তিতিরকে ডেকে মাঝবয়সী দারোগাবাবু প্রায় গদগদ হয়ে বলেছে, এই বয়সে বিয়ে হওয়াটা অতি সুলক্ষণ। জীবনে সুখী হতে হলে নাকি এই বয়ঃসন্ধিতেই ঘর বাঁধা ভাল। ধাড়ি বয়সে বিয়ে হয়ে সাংসারিক জীবনের কী হাল হয় তা চারদিককার অবস্থা দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে।

বাচ্চু তিতিরকে বলল, তুমি নিজে থেকেই তো বলতে পারতে।

তিতির গোঁজ মুখ করে বলল, কী বলল? চারদিকে গুরুজনেরা ঘিরে আছে, প্রত্যেকের চোখ আমার দিকে। দারোগাবাবুও

যে আসলে ওদেরই লোক তাও বেশ বুঝতে পারছিলাম।

বাচ্চু বিরক্ত হয়ে বলে, এজন্যই মেয়েদের কিছু হয় না।

এ কথায় বাচ্চা তিতির হঠাৎ যেন চনমন করে উঠল। তার গলায় রূঢ়তা ছিল না, কিন্তু বেশ একটু ধারালো গলায় বলল, দিদি, আপনি কিন্তু পুলিশের কাছে গিয়ে ভাল করেননি।

বাচ্চু অবাক হয়ে বলে, ভাল করিনি! পুলিশের কাছে তো সামান্য কথা, তোমার কেসটা নিয়ে আমি খবরের কাগজেও যাবো বলে ঠিক করে রেখেছি।

তিতির সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে, পুলিশ যদি আমার বাবা আর মাকে অ্যারেস্ট করে বা বাবার নামে যদি খবরের কাগজে নিন্দে হয় সেটা কি আমার খুব ভাল লাগবে ?

বাচ্চু একটু বিব্রত হয়ে বলে, দেখ, ভাল কিছু করতে গেলে নিজেদের গায়েও একটু কাদার ছিটে লাগে। ওটাকে ভয় পেলে পুরুষের অনুশাসন কেটে বেরোবে কি করে ?

তিতির মুখ নিচু করে কান্না সামলে বলে, আমাদের বাড়ি খুব ভাল। আমার বাবা ভাল, মা ভাল, আত্মীয়-স্বজনরাও ভাল। আমি তাদের ভীষণ ভালবাসি। আপনি দয়া করে এমন কিছু করবেন না যাতে তারা দুঃখ পায়।

বাচ্চু হতাশামাখা মুখে বলে, আমি তো তোমারই ভাল করতে চেয়েছিলাম তিতির। জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির ঘর করতে গেলে তোমার যে সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

সেটা আমি সহ্য করে নিতে পারব। যাদের ভালবাসি তাদের জন্য এটুকু কিছু নয়।

এটুকু! তোমার নিজের কাছে কাজটা হয়তো এক মহান আত্মত্যাগ, কিন্তু বিয়েটা হয়ে গেলে সেটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। গোটা দেশের মেয়েদের পক্ষে সেটা ভাল হবে না। তুমি এটাকে ব্যক্তিগত ঘটনা বলে মেনে নিতে পারো, কিন্তু আমার

কাছে এটা সব মেয়েরই অপমান বলে মনে হয়।

তিতির মাথা নেড়ে ধরা গলায় বলে, জানি। কিন্তু আমি একদম পাবলিসিটি চাই না। বিয়ে ভাঙতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার আপনজনেরা তাতে খুব অপমানিত হবেন যে।

ওটাই তো মুশকিল তিতির। তুমি আত্মীয়দের কথা ভাবছো, আমি ভাবছি মেয়েদের কথা। সব মেয়ের কথা। তুমি যে কেন একটু শক্ত মনের মেয়ে হলে না!

আমি পারব না দিদি।

তুমি তাহলে বিয়েটা মেনে নিচ্ছো?

বললাম তো, এটা আমার পারসোনাল স্যাক্রিফাইস।

বাচ্চু বিরক্ত হয়ে বলে, সব জিনিসকে ব্যক্তিগত লেভেলে নামিয়ে আনা মোটেই ভাল নয় তিতির। তাতে লড়াইয়ে হেরে যেতে হয়।

কথা আর এগোলো না। দুজনেই চাল মাত হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বাচ্চুকে এক প্রণাম করে চলে যাওয়ার আগে তিতির বলল, বিয়েতে কিন্তু আসবেন।

বাচ্চু এই আমন্ত্রণের কোনও জবাব দিল না। তিতিরকে সে খুব ভালবাসত। এই মেধাবী মেয়েটির মধ্যে সে এক ধরনের ইস্পাতদৃঢ়তাও দেখেছে নানা ঘটনায়। স্কুলে তিতির যে কোনও ব্যাপারে অগ্রণী। ভাল নাচে গায় অভিনয় করে, চমৎকার ডিবেট করতে পারে। জনসেবার কাজে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দশ তলার ফ্ল্যাটে আজ গভীর রাতে বাচ্চু তিতিরের কথা ভাবছে। বিয়েতে সে যায়নি, বিয়েতে বাধাও দেয়নি শেষ অবধি। কারণ তিতির নিজেই বিগড়ে বসে আছে।

তবে সে সায়ন নামে ছেলেটিকে ছাড়বে না, তার বাবাকেও না।

বাচ্চুর ঘুম নেই। যখন ঘুম থাকে না, তখন মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে যায়, পাগল-পাগল লাগে। আর সে এত একা।

তার প্রাক্তন স্বামী মণীশ সম্প্রতি বিয়ে করেছে। ঘটনাটা খুবই তুচ্ছ। আবার খুব তুচ্ছও নয়। মণীশকে সে চেনে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, মণীশের বউকে গিয়ে তার স্বামী সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে আসে।

নাটকীয়তা বাচ্চু ভালইবাসে। সে ঠোঁটকাটা, সাহসী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। তার বিশেষ প্রিয় বিষয় হলো, মেয়েরা এবং তাদের বীতশ্রদ্ধ জীবন। এ দেশের মেয়েদের জন্য কত কী করার আছে।

ঘুম নেই। বাচ্চু বারবার তার বিশাল ও সুন্দর বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে। ঘাড়, গলা, কনুই ভিজিয়ে নিচ্ছে জলে। কে যেন উপদেশ দিয়েছিল, এসব করলে ঘুম আসে। কিন্তু ঘুম অত সহজ নয়।

বাচ্চু বার দুই কফি খেল। পায়চারি করল, গান শুনল টেপ রেকর্ডার চালিয়ে। এসবই করে সারা রাত। একদম ভোর রাতে তার ঘুম আসে। সেই ঘুমও ছেঁড়া ছেঁড়া, উচ্চকিত, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নে ভরা। কেন এমন হয় সেটাই বুঝতে পারে না বাচ্চু। শরীরের কি ক্লান্তি নেই ?

কখনও সোফায়, কখনও বিছানায়, কখনও নিতান্ত মেঝের ওপরেই সে ভোরের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল খোলা বারান্দার ইজিচেয়ারে। দশ তলার বারান্দা বিপজ্জনক। প্রায় সময়েই ভোরের দিকে ঠাণ্ডা বাতাস বয় এবং ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয় থাকে।

আজ ডোরবেল-এর শব্দে উঠে টের পেল, গলা খুশখুশ করছে, শরীর ম্যাজম্যাজে।

ঝি কাজ করতে এল। বাচ্চু এক কাপ চা করে নিয়ে বাইরের ঘরে রেডিওর খবর শুনতে লাগল। আজ কিছুতেই তার মন নেই।

তিতিরের বউভাত গেছে কাল! একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবল

বাচ্চু। হ্যাঁ গতকালই তো। কয়েকদিনের মধ্যেই সে পাত্রপক্ষের মুখোমুখি হবে। বলবে, মেয়ে খুব সস্তা হয়েছে এদেশে, তাই না?

একটু বেলায় যখন স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল তখন শরীরে জ্বরের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে। অসুখ-বিসুখকে সে একটা কারণেই ভীষণ ভয় পায়। অসুখ হলে ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না এবং একা ঘরে বড্ড বোরড্ হতে হয়। আজ একটু গরম জলে গা মুছে নেয় বাচ্চু, স্নানটা বাদ রেখে। বেশ শীত শীত করছে। তার ঢাউস ব্যাগে সে পাতলা একটা শাল ভরে নিল। গ্রীষ্মকাল বটে, কিন্তু জ্বর এলে শালটা লাগবে।

স্কুল বেশ খানিকটা দূরে। একবার বাস বদলাতে হয়। অন্তত ঘণ্টা দেড়েকের ধাক্কা। ততটা ধকল আজ শরীর নিতে চাইছে না। বাসে দম বন্ধ করা ভিড়। বাচ্চু কেমন যেন অস্থির বোধ করছে। চোখে অন্ধকার দেখছে। শক্ত মেয়ে বলে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল রড ধরে। পদ্মপুকুরের কাছ বরাবর এসে হঠাৎ তার মনে হলো, আজকের দিনটা ছুটি নিলে কিছু খারাপ হয় না। পদ্ম-পুকুরেই তিতিরের শ্বশুরবাড়ি। লেনটার নাম তার মনে আছে, বাড়ির নম্বরটা একটু গোলমেলে। এক-এর আট বি বা আটের এক বি ধরনের কিছু। কিছু যায় আসে না। বিয়ে বাড়ি দেখলেই চেনা যাবে।

বাচ্চুর নামতে খুব কষ্ট হলো বাস থেকেই। নেমেই খাড়া চড়া রোদে দাঁড়াতেই মাথাটা ধরে গেল ঝম্ করে।

বাচ্চু রাস্তাটা পেরোলো। পানের দোকানে জিজ্ঞেস করে গলিটা চিনে নিয়ে খারাপ শরীরটা নিয়ে হাঁটতে লাগল। চওড়া গলি। বেশ নির্জন। দুধারে পয়সাওয়ালাদের বাড়িই বেশী। একটু বনেদিয়ানার আবহাওয়া বিরাজ করছে।

বাড়িটা একটু ভিতরের দিকে। বেশ বড় বাড়ি। ওপরে ম্যারাপ, বাড়ির সামনে রঙিন কাপড়ের ফটক। বাসি এঁটোকাঁটার

গন্ধে গা গুলোয়।

বিয়েবাড়িতে এখনও বেশ লোকজন রয়েছে। সে একজন বয়স্ক সুদর্শন মানুষকে ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নির্ভয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ বাড়ির ছেলের নাম কি সায়ন ?

লোকটি সামান্য তটস্থ হয়ে বলে, হ্যাঁ, আমি ওর কাকা।

আমি একটু তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

লোকটি দোনো-মোনো করে বলে, সায়নের বিয়ে হলো কিনা, আজ জোড়ে ঠাকুরবাড়ি যাওয়ার কথা শুনছিলাম।

আমি জানি। তবু একটু দেখা করতে চাই।

আপনি এসে বসুন, আমি দেখছি।

লোকটি তাকে এনে একটি মস্ত অগোছালো বৈঠকখানায় বসাল। ঘরে রাতে অনেকে শুয়েছে। শতরঞ্জি জড়ো হয়ে পড়ে আছে দেয়ালের কাছে। এখনও ঝাঁটপাট পড়েনি বোধহয়। ব্যস্ত-সমস্ত লোকজন যাতায়াত করছে।

লোকটি ভিতরবাড়িতে গেলে একা কিছুক্ষণ বসে রইল বাচ্চু, তারপর হঠাৎ মনে হলো, দুম করে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠাটা ঠিক হবে না বোধহয়। প্রথম পরিচয়েই একটি ছেলেকে কিছু বলতে গেলে যদি হিতে বিপরীত হয় ?

এ বাড়িতে তিতির আছে সে জানে। তবু তিতিরের সঙ্গে তার আজ আর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সায়নের সঙ্গেই।

অন্তত পনেরো মিনিট বসে থাকতে হলো বাচ্চুকে। তারপর খুব বাহারী ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরা একটা ছেলে ভিতর-বাড়ি থেকে বৈঠকখানায় এসে দাঁড়াল। মুখে চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, যেমনটা বিয়ের পর দেখানোর কথা নয়। ছেলেটা বাচ্চুর দিকে চেয়ে একটু থমকে বলল, আপনি—? কে একজন ভদ্রমহিলা আমাকে খুঁজছেন শুনলাম।

বাচ্চু শান্ত গলায় বলে, আমি। আপনিই কি সায়ন ?

হ্যাঁ। কী দরকার বলুন তো।

আপনি কি খুব ব্যস্ত? যে কথাগুলো বলতে চাই তাতে কিছু সময় লাগবে। আমার পরিচয় খুব সামান্য। আপনার স্ত্রী তিতির আমার ছাত্রী। আমার নাম মোহিনী সেন।

ওঃ। বলে অপ্রতিভ সায়ন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাচ্চুর শরীর বেশ খারাপ লাগছে। রোদে সামান্য হেঁটেছে বলেই বোধহয় অস্থির লাগছে ভিতরটা। এই ছায়াচ্ছন্ন ঘর ছেড়ে এখনই তার বেরোতে ইচ্ছে করছে না। তবে তিতিরের এই তথা-কথিত স্বামীটিকে তার প্রথম দর্শনেই ভারী ভাল লাগল। চেহারাটা একটু মেয়েলী, তেমন কঠিন ব্যক্তিত্ব হয়তো নেই, কিন্তু ছিপছিপে নমনীয় শরীর আর সুন্দর ডৌলের মুখশ্রীর মধ্যে একটা মায়া মাখানো আছে। তিতির হয়তো ওকে পছন্দ করে ফেলেছে। করারই কথা। বয়ঃসন্ধির মেয়েরা তেমন শক্ত মনের মানুষ হয়ও না।

সায়ন মুখ নিচু করে নিজের করতলের দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে বলে, আপনি কি তিতিরের সঙ্গে দেখা করবেন?

বাচ্চু বলল, তার কোনও দরকার নেই। প্রয়োজনটা আপনার সঙ্গেই।

তিতিরের দিদিমণির তার সঙ্গে কী প্রয়োজন সেটা যে সায়ন ভেবে পাচ্ছে না তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। বাচ্চু আন্দাজ করছিল, ছেলেটার বয়স বাইশ তেইশের বেশী হবে না! একটু বোধহয় লাজুক স্বভাবের। চোখে চোখ রেখে তাকাচ্ছে না। তিতিরের সঙ্গে খুবই মানানসই বর। তবে তাতে তো চিঁড়ে ভিজবে না। বাচ্চুর বুকে অনেক বিষ জমে আছে মেয়েদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখে। সে কি সহজে মুগ্ধ মোহিত হয়ে যেতে পারে?

একটু ধীরে উঠল বাচ্চু। বলল, তাহলে আমি আসি?

সায়ন একটু চঞ্চল গলায় বলে, না, আপনি একটু বসুন। মা আসছেন।

বাচ্চু একটু হেসে বলে, আমি তো আর কারও সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। দরকারটা শুধু আপনারই সঙ্গে।

সায়ন লাজুক মুখে বলে, শুধু মুখে মা আপনাকে যেতে দেবেন না, একটু বসুন।

আপনাদের বোধহয় জোড়ে কোথাও যাওয়ার কথা আছে, না ? আপনার কাকা বলছিলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। দক্ষিণেশ্বর। আপনার কী দরকার তা কি এখন বলা যায় না ?

তাড়াহুড়োয় কি সব কথা বলা ভাল ?

খুব জরুরী কথা কিছু ?

একটু জরুরী। তবে সাংঘাতিক কিছু নয়। আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

বাচ্চু দেখতে পেল, ঘোমটা মাথায় এক মহিলা হাতে মিষ্টির প্লেট নিয়ে আসছেন। সায়নের মা বলে চিনতে একেবারেই কষ্ট হয় না। হুবহু একরকম মুখ।

তুমি কোথা থেকে আসছ মা ?

বাচ্চু সামান্য হেসে বলে, আমাকে চিনবেন না মাসিমা। আমি আপনার বৌমার স্কুলের দিদিমণি।

ও মা ! তাহলে তো মস্ত কুটুম। বসো, একটু মিষ্টি মুখ করে যাও।

এইসব মিষ্টি আন্তরিক ব্যবহারের মধ্যে একটা মাদকতা আছে বোধহয়। বাচ্চু বসে পড়ল। মিষ্টি খাওয়ার আগে সে ভারী কাঁসার গেলাসের সবটুকু জল শুষে নিল। এত তেষ্টা পেয়েছিল তা বুঝতে পারেনি এতক্ষণ।

তোমার শরীরটা কি খারাপ মা ?

ও কিছু নয়। কাল রাতে ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর জ্বর হয়েছে।

এই সময়টায় হয়। দাঁড়াও, তোমাকে একটু জল এনে দিই, আর বউমাকে ডাকাচ্ছি।

জল একটু দিন, কিন্তু তিতিরকে ডাকবার দরকার নেই।

ও মা সে কী! ছাত্রী তো পুত্রীতুল্য। তার বাড়িতে এসে দেখা না করে গেলে সে দুঃখ পাবে না?

আসলে আমি ওকে ডিস্টার্ব করতে চাইছি না!

ডিস্টার্ব আবার কিসের? নতুন বিয়ে হলে মেয়েদের কাছে বাপের বাড়ির হুলো বেড়ালটাকেও ভাল লাগে। বাব্বাঃ, বাপের বাড়ি যে কি জিনিস! আবার শ্বশুরবাড়ি যখন পুরোনো হয় তখন আবার বাপের বাড়ির টান কত আলগা হয়ে যায় দেখ। তা হ্যাঁ মা, তোমার তো দেখছি বিয়ে হয়নি। অমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো চেহারাটা নিয়ে মাস্টারি করতে যাও, ছোঁড়ারা পেছনে লাগে না?

মুখে একটা সুস্বাদু রসগোল্লার টুকরো ছিল, সেটা আর একটু হলে গলায় গিয়ে আটকাত বাচ্চুর। সে কোনওরকমে হাসি সামলে বলে, ছেলেরা আমাকে ভয় পায় মাসীমা।

ভয় পায়! সে কী? তোমার তো নরম মুখচোখ, কী সুন্দর দেখতে! রোদে জলে বেরোতে হয় বলেই বুঝি গায়ের রংটা একটু জ্বলে গেছে।

আমি কালোই।

না বাপু, কালো ধলো আমি খুব চিনি। নিজের যত্ন বেশী করো না, না? সেটাই ভাল। মেয়েরা সবসময় নিজের শরীরটা বা মুখটা নিয়ে এত উল্টোপাল্টা খায় যে, আমাদের চোখে যেন ভাল ঠেকে না। এই তো তুমি, কেমন একখানা সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরেছো, মুখে রুজ পাউডার লিপস্টিক দাওনি, টান করে চুল বেঁধেছো, কী ভাল দেখাচ্ছে বলো!

এই প্রাচীনপন্থী মহিলার পাল্লায় পড়ে বাচ্চুর ভেতরটায়

হাসি গুরগুর করছে। মাতৃভক্ত ছেলেটি মায়ের ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে। মুখখানায় একটু অবাক ভাব। আড়চোখে লক্ষ্য করল বাচচু। এ বাড়িতে তার যেন ভাল লাগছে। কেন লাগছে তা সে বুঝতে পারছে না।

মহিলা পাশের সোফায় বসে বললেন, শুনলাম তুমি সানুর কাছে কী দরকারে এসেছো! সত্যি নাকি?

সত্যি মাসীমা।

আমি তো ভেবে মরছিলাম, কী না জানি দরকার। তবে ভয় পেও না মা, বউমার পড়া বন্ধ হবে না। অষ্টমঙ্গলা হয়ে গেলেই বউমাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো। মাধ্যমিক পাশ করলে নিয়ে এসে ফের কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবো। শুনেছি খুব ভাল ছাত্রী!

হ্যাঁ, খুবই ভাল ছাত্রী।

তোমাকে ধন্যি বাপু। ছাত্রীর পড়াশুনোর যাতে ক্ষতি না হয় তা নিয়ে বলতে এসেছিলে? তোমার বাপু দয়ামায়া দবদ আছে।

বাচচু সব জায়গাতেই ঠোঁটকাটা বলে কুখ্যাত। কিন্তু এখানে সে কেন যেন বলার মতো কথাগুলো শানিয়ে তুলতে পারছে না। তার কি মায়া হচ্ছে? নাকি শরীরটা ভালো নয় বলে মনটাও কঠিন হয়ে উঠতে পারছে না?

একজন দাসী গোছের মহিলার সঙ্গে ধীর পায়ে যখন তিতির সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল তখন দুজনেই অবাক। তিতির তার দিদিমণিকে একেবারেই আশা করেনি বলে অবাক। বাচচু অবাক এক রাতে তিতিরের পরিবর্তন দেখে। না, তিতিরের চোখে মুখে কোথাও আহ্লাদের প্রকাশ নেই। বরং কেঠো শুকনো ক্লান্ত চেহারা। ঝকমকে সবুজ বেনারসীতে ওকে যেন আরও বেমানান লাগছে। কোথায় একটা ছন্দপতন ঘটে গেছে।

দিদি, আপনি ?

মিষ্টির আধখাওয়া প্লেটটা মেঝেয় রেখে বাচ্চু হাসিমুখে বলে, বিয়েতে যাইনি বলে কমপেনসেট করতে চলে এলাম।

বোধহয় বিস্ময়ের ঘোরেই যে-কথাটা বলা উচিত নয় সেটাই সকলের সামনে বলে ফেলল তিতির, কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন আমার বিয়েতে আসবেন না। আজ এ জেসচার অফ প্রোটেস্ট !

বাচ্চু অপ্রতিভ হলো বটে, কিন্তু বুঝতে দিল না, মিষ্টি একটু হেসে বলল, ছাত্রী হলো কন্যাসমা, তোমার জন্য ভীষণ মন খারাপ লাগছিল যে ! আর এসে মোটেই খারাপ কাজ করিনি। মাসিমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, সেটাই মস্ত লাভ। তুমি ভাল আছ তো তিতির ?

সায়নের মা খুব অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ মা, তুমি কি রাগ করে বিয়েতে আসনি নাকি ? তুমি বুঝি ভেবেছিলে আমরা বউমার পড়া বন্ধ করে দেবো !

বাচ্চু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, গৌরীদানটাও তো ভাল নয় মাসীমা ?

ঠিক কথা মা। কচি বয়সে বিয়ে হয়ে কী হলো বলো তো আমাদের ! দুনিয়াটা কেমন তাই বুঝতে পারলুম না। না হলো লেখাপড়া, না হলো জ্ঞানগমিা, কলাগাছটার মতো শেকড়বাঁধা হয়ে একঠাঁই গেড়ে বসে গেলুম। রাগ করা কিছু অন্যায় হয়নি তোমার।

সায়ন একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে চোরা-চোখে দেখছে বাচ্চুকে। বাচ্চুর শরীর শিরশির করছে জ্বরে, মাথায় প্রবল যন্ত্রণা, তবু তার মধ্যে এই একটা জিনিস ভাল লাগছে তার, সায়ন ছেলেটি ভারি মিষ্টি। হয়তো খুব ঠকে যায়নি।

একটি বউ মতো ঝি এসে কানে কানে কি বলতেই সায়নের মা বললেন, কাজের বাড়ি মা, আমার কি বসে দুদণ্ড কথা বলার উপায় আছে ! তোমরা বসে কথা কও, আমি আসছি।

শাশুড়ী চলে যেতে তিতির বাচ্চুর পাশে একটু তফাত রেখে বসে বলে, কেন এলেন বলেননি কিন্তু !

তোমাকে কিছু বলতে আসিনি তিতির। আমি তোমার বরের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এটা ঠিক পরিবেশ নয়, আর আমারও শরীরটা আজ ভাল নয়, পরে হবে।

সেই সব কথা তো ! বিয়ে নিয়ে ?

হ্যাঁ তিতির, তোমার আপত্তি নেই তো !

না, বলে তিতির নাথা নাড়ল, আপত্তি হবে কেন ?

বিয়ের পর মেয়েরা পাল্টে যায় তিতির, খুব তাড়াতাড়ি পাল্টায়। বিবাহিত জীবনের একটা মাদকতা আছে।

আবার তিতির সবেগে মাথা নাড়ল, আমার নেই।

সায়ন এসব কথা শুনতে পেল না দূর থেকে, তবে সে ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

তোমাকে অসুখী দেখাচ্ছে কেন তিতির ? মুখে একটুও আনন্দ নেই !

আমার মন ভাল নেই দিদি। আমার ভাল লাগছে না।

সায়ন কিন্তু বেশ ছেলে।

হতে পারে। আমার সঙ্গে তেমন আলাপ হয়নি।

সে কী ! ফুলশয্যার রাতেই তো গল্প হয়।

আমাদের হয়নি। ও ঘরে ছিলও না।

বাচ্চু একটু চুপ করে থেকে বলে, কি জানি কেন তোমার বিয়ের আগে আমি যা বলতাম তোমাকে তা আজ বলতে ইচ্ছে করছে না। বরং বলতে চাইছি, যা হয়ে গেছে তা মেনে নেওয়াই ভাল।

আপনি বলছেন এ কথা ?

আমিই বলছি। আজ চলি তিতির। শরীরটা ভাল নেই, তোমরাও বেরোবে।

এই বলে উঠে পড়ল বাচ্চু। ফিরে তাকাল না। বারান্দায় সিঁড়ির কাছে সায়ন দাঁড়িয়ে আছে।

আপনি কি যেন বলবেন বলছিলেন। কবে বলবেন ?

আমি সাউথেই থাকি। খুব দূরে নয়। একদিন যদি আমার ফ্ল্যাটে আসেন তো কথা হবে। আসবেন সায়ন ?

সায়ন দুঃখিত মুখ করে বলে, কিন্তু আমি তো আর কয়েক-দিনের মধ্যেই হস্টেলে চলে যাবো। ছুটি ফুরিয়ে এল, সামনে পরীক্ষা।

মিষ্টি হেসে বাচ্চু বলে, ছুটি ফুরোনোর আগেই আসুন। কাছেই তো !

সায়ন একটু গোঁজ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, ঠিক আছে, যাওয়ার চেষ্টা করব।

বাচ্চু একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল রাস্তায় এসে। বাড়ি ফিরেই একটা চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে এক ঘোর জ্বরের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। জ্বর কি হিরন্ময় ! গা ভরে জ্বর আসছে, মাথা ছিড়ে পড়ছে তবু এক মোহময় আবরণ যেন ঢেকে ফেলেছে তার সব যন্ত্রণাকে। সে আধো ঘুমের মধ্যে নানা রঙিন স্বপ্ন দেখতে লাগল। নীল আকাশে অজস্র প্রজাপতির মতো পরীর দল উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা গভীর সবুজ বাগানে ফুলের জঙ্গল যেন ! একটা ছোট্ট টয়ট্রেন যেন পায়ে মল পরে একটা ছোট্ট রেলপোল পার হয়ে গেল।

জ্বর তার সময়ের জ্ঞানকে লুপ্ত করে দিয়েছিল। প্রকৃত চেতনা ফিরল পরদিন সকালে। ঝি এল।

ও দিদি, তোমার কী হয়েছে বলো তো! চোখ যে টকটকে লাল!

আর বলিস না, খিদের চোটে প্রাণ যাচ্ছে, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা উপোস।

দাঁড়াও, কিছু একটু করে দিই, বার্লি খাবে?

দূর! আগে একটু দুধ দে। তারপর রুটি কর।

সকালের দিকে জ্বর কিছু কম রইল। ছোটোখাটো অসুখে বাচ্চু কখনও ডাক্তার দেখায় না। ওষুধ খাওয়া তার কাছে এক শাস্তি বিশেষ। কিন্তু বিকেলের দিকে ফের জ্বর বাড়ল।

আবার সেই ঘোর ভাব। আবার স্বপ্ন। বিশাল ফ্ল্যাটবাড়িতে একা নানা স্বপ্নের মায়াজালে আটকে থাকা বাচ্চু কিছুই পারম্পর্য নিয়ে ভাবতে পারছে না। কিন্তু তার ভিতরে একটা ওলটপালট ঘটেছে। একটা শুকনো, ভবিষ্যৎহীন জীবন ছিল তার, স্বপ্ন বা প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিত না। কিন্তু কোথা থেকে এক মৌসুমী বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল মাটি। সোঁদা গন্ধ, অংকুরের আভাস! এ কী হচ্ছে?

স্বপ্নের মধ্যেই ডোরবেল শুনতে পাচ্ছিল বাচ্চু। দিন না রাত তাও তার বোধ ছিল না। অত্যন্ত ক্লান্তিতে চোখ খুলে দেখল, ঘর ভরা আলো। বেলা হয়েছে।

দরজা অবধি যেতে মাথা ঘুরতে লাগল, পা টলতে লাগল, সময় লাগল অনেকটা। তার মধ্যে ডোরবেল বাজল আরও বার কয়েক।

দরজা খুলে পাল্লাটা ধরে ঝুল খেয়ে নিজেকে সামলাল বাচ্চু। আবছা চোখে মানুষটাকে প্রথমটায় চিনতে পারল না। আজ পোশাকটিও অন্য রকম, নেভী ব্লু কর্ডের প্যান্ট আর একটা নীল আর হলুদ স্ট্রাইপওলা টি শার্ট।

আরে! আপনি তো খুব অসুস্থ দেখছি!

হ্যাঁ, ভেতরে আসুন প্লীজ। দরজাটা ছেড়ে লুটোন আঁচল কুড়িয়ে নিল বাচ্চু।

সায়ন ভিতরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে একটু বোধহয় অবাক হলো। বিশাল ফ্ল্যাট, অথচ তেমন কোনও আসবাবপত্র নেই।

দরজাটা বন্ধ করে দিন প্লীজ!

সায়ন দরজা বন্ধ করে দিল।

ওই চেয়ারটা আমার বিছানার কাছে টেনে নিয়ে এসে বসুন। আমি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে বা বসে থাকতে পারছি না। কিছু মনে করবেন না, কেমন?

কি মনে করব ? কিন্তু আপনার ফ্ল্যাটে তো কেউ নেই দেখছি। কে আপনার দেখাশোনা করছে ?

দেখাশোনা কেউ করে না। আমি সেল্ফ ডিপেণ্ডেন্ট। আজ বোধহয় আমার কাজের মেয়েটাও আসেনি।

তাহলে কী হবে ?

কিছু হবে না। আমাদের আটতলায় একজন ডাক্তার থাকেন। খবর দিলে তিনি এসে দেখে যান। দরকার পড়লে ডাকব। চিন্তার কিছু নেই। আমি অসহায় নই।

সায়ন এই অহংকারী মেয়েটার মুখোমুখি বসল। তারপর বলল, আপনার অসুখ জানলে আমি একজন ডাক্তার নিয়েই আসতাম। আপনি কিছু খেয়েছেন ?

না, খেয়ে নেবো।

জ্বর হলে মাথা ধোয়াও দরকার।

বাচ্চু মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনাকে অত ভাবতে হবে না তো। জামাইমানুষ প্রথম এলেন, এখন কী দিয়ে আপনার সঙ্গে ভদ্রতা করি বলুন তো ! চেষ্টা করলে হয়তো এক কাপ চা করে দিতে পারব।

সায়ন সবেগে মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, আমি চা বড় একটা খাই না। নেশাই নেই আমার।

শোওয়ার ইচ্ছে থাকলেও শেষ অবধি শুলো না বাচ্চু। বালিশ কোলে নিয়ে বাবু হয়ে বসল বিছানায়। বলল, ঠিকানা কে দিল ? আমি তো সেদিন দিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিলাম।

আপনার ছাত্রীই দিয়েছে।

সে এল না কেন ?

সে বলল, তোমাকে ডেকেছে, তুমি যাও।

বাচ্চু নিজের নাসামূল দুআঙুলে চেপে ধরে একটু চুপ করে থেকে বলল, একা এসেই ভাল করেছেন। একটু বসবেন

তো ! নাকি সময় নেই ?

সময় আছে। কিন্তু আজ এই শরীরে আপনাকে বেশী কথা বলতে হবে না। আমি বরং অন্য কোনওদিন আসব।

না, তা হয় না। আপনি বসুন, আমি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে আসছি।

বাথরুমে এসে দরজা বন্ধ করে বেসিনে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হলো বাচ্চুকে। সে চোখে অন্ধকার দেখছে ! জ্বরের জন্য নয়, অনেকক্ষণ উপোসী থাকার ফলে তার শরীর এখন ভীষণ দুর্বল। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সামলাতে চেষ্টা করল সে নিজেকে। মুখে জল দিতেই টকচা জিভে স্বাদটা এত খারাপ লাগল যে দু ঝলক অম্বলের বমি বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। কাঁপা হাতে চোখে জলের ঝাপটা দিল সে। তোয়ালেটা টেনে নিয়ে মুখে চেপে রইল অনেকক্ষণ। তারপর তোয়ালেটা নিয়েই দরজাটা কোনওক্রমে খুলল সে।

ঠিক তারপরেই সে টের পেল, শরীরটা ভূমিকম্পে দুর্বল ইমারতের মতো পড়ে যাচ্ছে। শরীরটা যে বিকট শব্দ করে মেঝের ওপর পড়ল সেই শব্দটাও শুনতে পেল সে। তারপর সব অন্ধকার।

চোখ যখন চাইল তখন অনেকটা সময় কেটে গেছে। স্মৃতিহীন, বোধহীন মাথা। অস্বচ্ছ চোখ।

নিজের চারদিক সম্পর্কে সচেতন হতে আর একটু সময় নিল সে। তারপর বুঝল, তার মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারা, তার চোখে এবং কপালে জল সিঞ্চনের সিক্ত ভাব। সে বিছানায় শোয়া, কে একটা কম্বল দিয়ে গলা অবধি ঢেকে দিয়েছে। এত যত্ন কে করল তার ! জলের মিষ্টি শীতল আওয়াজ সংগীতের মতো শোনাচ্ছে।

মাথা সামান্য ওপর দিকে তুলতেই সে সায়নকে দেখতে পেল। উদ্বিগ্ন সুন্দর একটি মুখ। খুব মনোযোগ দিয়ে জল ঢালছে তার মাথায়।

একটু শিহরিত হলো বাচ্চু, খুব সম্ভব বাথরুমের কাছ থেকে

তাকে তুলে এনেছে সায়নই। কোলে করে নাকি? এমা! তখন বোধহয় বাচ্চুর পোশাকও সংবৃত ছিল না! লজ্জায় সে সিঁটিয়ে গেল।

থাক। আর জল ঢালতে হবে না।

সায়ন একটু ঝুঁকে বলে, জ্ঞান ফিরেছে? খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন।

সরি। কিন্তু আপনি এত কষ্ট করতে গেলেন কেন বলুন তো!

কষ্ট! না, তেমন কিছু কষ্ট হয়নি। তবে যেরকম শব্দ করে পড়ে গিয়েছিলেন তাতে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বাচ্চু। শরীরটা অনেক ভাল লাগছে। বোধহয় অম্বলের জলটা পেট থেকে বেরিয়ে যাওয়াতেই অনেকটা সুস্থ লাগছে তার। আর মাথায় জলের ধারাও অনেকটা কাজ করেছে।

এবার কিছু খাবেন?

প্লীজ, আপনি আর কিছু করতে যাবেন না। আমার ভীষণ লজ্জা করছে কিন্তু।

আপনি তো অশক্ত। অশক্ত বা অসুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে লজ্জার কিছু নেই। আপনার কিচেন আমি দেখে এসেছি। ফ্রিজে পাউরুটি আর জেলি আছে। মাখনও। আপনার জন্য আমি কয়েক পিস রুটি সেঁকে রেখেছি।

বাচ্চু তার ঘাড়ের তলা থেকে তোয়ালেটা টেনে বের করে চুল মুছতে মুছতে উঠে বসে পড়ল।

সায়ন উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, আহা, করেন কি?

আপনি এত সব কেন করতে গেলেন? ছিঃ ছিঃ।

আপনি কেন যে লজ্জা পাচ্ছেন!

লজ্জার অনেক কারণ ঘটেছে। আপনি একটু ও ঘরে যাবেন দু মিনিটের জন্য? আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে চাই।

অবশ্যই। বলে সায়ন পাশের ঘরে গেল।

বাচ্চু উঠল, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সে চুল আঁচড়ে শাড়ি পাল্টে নিল। মুখ মুছল শুকনো করে। শুকনো ঠোঁটে একটু ক্রিম ঘষল। আর এই করতেই তার দম ফুরিয়ে গেল।

এবার আসুন।

সায়ন এল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তিতিরের বরকে! সুন্দর শুধু বাইরেটাই নয়, স্বভাবটিও।

এবার কিছু খেয়ে নিন।

আপনি বসুন, আমি খাবার নিজেই নিয়ে খেতে পারব।

আবার যদি পতন ও মূর্ছা হয়?

আর হবে না। শরীর অনেক ভাল লাগছে।

সত্যিই ভাল লাগছে তো! না লজ্জায় বলছেন!

সত্যিই, আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম?

বেশীক্ষণ নয়। উইকনেস থেকে হয়েছিল। ওটা সিরিয়াস কিছু তো নয়। মিনিট কুড়ি সময় লেগেছে রিভাইভ করতে।

আমি একটা বিচ্ছিরি মেয়ে।

সায়ন হেসে ফেলে বলল, একেবারেই একমত হওয়া গেল না।

একটু বসুন। আমি রান্নাঘর থেকে আসছি।

দেখবেন কিন্তু।

বাচ্চু রান্নাঘরে এসে দেখল, খুব গোছানো হাতে না হলেও গ্যাস জ্বালিয়ে ছয় পিস রুটি টোস্ট করেছে ছেলেটা। প্লেটে সাজিয়ে ঢেকেও রেখেছে। বাচ্চু চায়ের জল বসাল। রুটিতে মাখন লাগাল। চা করে দু কাপ চা আর টোস্ট সাজিয়ে ট্রে নিয়ে ঘরে এল।

এই তো দেখছি, অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছেন।

হ্যাঁ, আপনার হাতের গুণ আছে। এবার চা খান।

বাচ্চু বিছানায়, মুখোমুখি চেয়ারে সায়ন, বসে চা খেল দুজনে।

টোস্ট কামড়াল। আর নীরবতার মধ্যে অনেকবার চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনের।

কী হচ্ছে তা কিছু বুঝতে পারছে না বাচ্চু। তার বয়স সাতাশ। আর সায়নের বাইশ তেইশ। তার ছাত্রীর নতুন বর। অথচ সব বাঁধ ভেঙে তার বুকে এক শিহরিত আনন্দ কেন ঝড় তুলছে? কেন এই অসুখের শরীরেও তার নানারকম অদ্ভুত ইচ্ছে হচ্ছে?

সায়ন চা শেষ করে বলল, ডাক্তারবাবুর নামটা কী বলুন তো! একটা খবর দিই।

আমার আর ডাক্তার লাগবে না।

লাগবে না?

না, আমার ডাক্তার তো সামনেই বসে আছে।

দুজনেই হাসল।

সায়ন মাথা নেড়ে বলে, আবার যদি জ্বর আসে? আজকাল খুব অদ্ভূত জ্বর হচ্ছে চারদিকে। অনেকের কাছে শুনি একমাস দুমাস করে জ্বরে ভুগছে লোকে। ড্রাগ ইমিউনিটি হয়ে যাওয়ায় অ্যান্টিবায়োটিকে ভাল কাজ হচ্ছে না।

যদি তাই হয় তাহলে ডাক্তার ডেকে আর কী লাভ বলুন। তবে আমার অসুখ যে সেরে গেছে তা বেশ বুঝতে পারছি।

ইয়ার্কি করছেন।

গায়ে হাত দিয়ে দেখুন, জ্বর নেই।

বাচ্চুর বাড়ানো হাত ধরল সায়ন। সমস্ত শরীর বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগল বাচ্চুর। শ্বাস ঘন গাঢ়ও হয়ে উঠল। জীবনে এমন পরম আনন্দের ক্ষণ যেন তার আর কখনও আসেনি। সে কি ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

আপনার গা এখন যেন বড্ড বেশী ঠাণ্ডা।

জ্বর নেই তো?

না, কিন্তু এত ঠাণ্ডা কেন ?

বাচ্চু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জ্বর হলেও দোষ, সারলেও বুঝি দোষ ?

তা নয়। গা ঠাণ্ডা হওয়া এক্সট্রিম দুর্বলতার লক্ষণ। আপনি ভাল করে খাবেন কিন্তু। নইলে শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

খাবো। একটু অন্য কথা বলুন না।

সায়ন করুণ মুখে বলে, আমি এত ঘাবড়ে গেছি যে কথাটথা কিছু মাথায় আসছে না। বেলাও হলো। কিন্তু আপনার কী ব্যবস্থা করে রেখে যাবো বলুন তো। আপনি তো একা, কে দেখবে ?

একাদের জন্যও পৃথিবীতে ব্যবস্থা আছে। এই যেমন আপনি এসে পড়ে আমার জন্য কত কিছু করলেন।

আপনি কি ভাবছেন, আমি চলে গেলে প্রকৃতির নিয়মে আর একজন এসে হাজির হবে ?

বাচ্চু হেসে ফেলল। বলল, না, অতটা ভাবছি না। তবে মনে হচ্ছে আমিই এবার চাঙ্গা হয়ে উঠে পড়ব।

ওর হাতের স্পর্শটাই কি একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো বয়ে যাচ্ছে তার রক্তস্রোতে ? কী যে হচ্ছে বাচ্চুর ভিতরে তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না।

সায়ন উঠল। বলল, আপনি কী একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন আমাকে। সেটা বোধহয় এই অবস্থায় বলা সম্ভব হবে না। আমি হোস্টেলে ফিরে যাচ্ছি। খুব জরুরী কিছু কি ?

বাচ্চু বাচ্চাদের মতো সজোরে মাথা নাড়ল, তেমন জরুরী নয়। তবে কথাটা আমার বলা দরকার। ফের কবে দেখা হবে বলুন তো ! কবে যাচ্ছেন হোস্টেলে ?

অষ্টমঙ্গলার পর। আর তিন দিন বাদে অষ্টমঙ্গলা।

তাহলে তো সময় আছে। আর আসবেন না বুঝি এর মধ্যে ?

সায়নকে একটু চিন্তিত দেখাল। একটু গভীরতা থেকে উঠে আসতেই যেন সময় লাগত তার। বাচ্চুর দিকে চেয়ে বলল, কথাটা আপনাকে বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু ব্যাপারটা এত সেনসেটিভ যে বলার মতো কাউকে পাচ্ছিও না। অথচ ব্যাপারটা খুব প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাচ্চু একটা প্রত্যাশা নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তিতিরকে নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে কি ?

সায়ন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত করে বলে, হ্যাঁ। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে দুজনেই দুজনের প্রবলেম।

আমার কি শোনা উচিত হবে ?'

আপনার ছাত্রী ছিল, প্রিয় ছাত্রী। সেইজন্যই ভাবছিলাম আপনাকে বলা যায় কিনা।

বাচ্চু হাঁটু জড়ো করে তার ওপর মুখ রেখে বসল। বলল, বলুন, শুনি।

বিয়েটা আমাদের কারোই ইচ্ছেমতো হয়নি। এই বয়সে কেউ বিয়ে করে বলুন ? শুধু বাবার জন্য ব্যাপারটা ঘটে গেল। তিতিরের কোনো ওবলিগেশন ছিল না, ও রাজী হয়েছিল বাড়ির প্রেসারে। কিন্তু এখন আমরা কেউই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না। বিশেষ করে তিতির।

তিতির কী বলছে ?

হয়তো ডিভোর্সের কথা ভাবছে, ঠিক জানি না। বিয়ের পর ওর সঙ্গে আমার খুব সামান্যই কথা হয়েছে। তাতেই বুঝেছি ও একদমই বিগড়ে আছে।

বাচ্চু বিষণ্ণ মুখে বলল, তাই-ই তো হওয়া উচিত। মেয়েদের এখনও যে কেন কমোডিটির পর্যায়ে রাখা হয়েছে সেটাই বুঝতে পারি না। আপনিও কি বোঝেন ?

আমি কিছুই বুঝি না। লেখাপড়া নিয়ে ছিলাম, আমার

চারদিকে তাকানোর সময়ও নেই। এই ফ্যাঁকড়া ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আমার পড়াশুনোরও খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। বিয়েটাই তো একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার, তার ওপর আবার তিতিরের ব্যবহার, দুটোই আমার কাছে ভীষণ প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাচ্চু একটু কঠিন মুখে বলল, ডিভোর্সের কথা না ভাবাই ভাল। যে বিয়ে হয়নি তার আবার ডিভোর্স কিসের ?

হয়নি ! তার মানে ?

আপনি বাইশ বছরের একটি খোকা। ছেলে বা মেয়ে একটা বিশেষ বয়স অ্যাটেন করার আগে তাদের বিয়ে আইনত সিদ্ধ নয়। আদালতে গেলে এই বিয়ে স্বীকার তো করাই হবে না, উপরন্তু মাইনরের ম্যারেজ বলে আপনাদের পানিশমেন্টও হতে পারে।

সায়ন একটু শুকনো মুখে বলে, হ্যাঁ, সেটা জানি।

যদি জানেন তাহলে বিয়েটা স্বীকার না করলেই হয়।

স্বীকার ! না, আমরা কেউই মনে প্রাণে বিয়েটা মেনে নিতে পারছি না। আমার নিজের ভীষণ মন খারাপ।

আর তিতির !

তার কথা ভাল জানি না। তবে মনে হচ্ছে, রেগে আগুন হয়ে আছে।

তাহলে তো আপনাদের সেপারেট হয়ে থাকাই ভাল।

তাই হয়তো থাকব। কিন্তু গার্জিয়ানরা কি সহজে ছাড়বেন ?

বাচ্চু একটু হেসে বলে, আপনাদের সেপারেট তো এমনিতেই থাকতে হচ্ছে। আপনি থাকবেন হোস্টেলে, আর তিতির বাপের বাড়িতে।

হ্যাঁ। কিন্তু তারপর ?

তারপর কিছু একটা হবে। সময় একটা মস্ত ফ্যাক্টর। তিতির প্রাপ্তবয়স্কা হলে হয়তো নিজেই বিয়েটা ভেঙে দেবে বা ভাঙা বিয়েটাই যে বে-আইনী হয়েছিল তা আদালতে জানিয়ে দেবে।

সায়ন চিন্তিত মুখে বাচ্চুর দিকে চেয়ে বলে, বিয়েটা যে ভাঙা তা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তিতিরের সঙ্গে আমার কখনও বনিবনা হবে না। আমি শুধু ভাবছি, বিয়েটাকে কি করে ভুলে যাওয়া যায়।

খুব রাগ বুঝি তিতিরের ওপর ?

রাগ! না তা নয়। তবে আমি আর এক ঘরে থাকতেও পারছি না। তিতিরও পারছে না। দুজনের কেউ সারা রাত বারান্দায় বসে কাটিয়ে দিচ্ছি।

বাচ্চু সামান্য ধরা গলায় বলে, ওকে কি আপনার পছন্দ হয়নি ?

পছন্দ! না, একেবারেই নয়। আমার মতামত দেওয়ার কিছু ছিল না। আমি শুধু বাবার আদেশ পালন করেছি।

আপনি যে আমার কাছে এসেছেন তা কি তিতির জানে ?

সায়ন মাথা নেড়ে বলে, কেউ জানে না। আমার মনে হচ্ছিল, আপনি হয়তো আমাকে এই মানসিক অবস্থায় কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। আমার মনটা খুব খারাপ।

তাহলে আমার কাছে আরও একটু বসে থাকুন।

বসে থাকব ?

বাচ্চু বেফাঁস কথাটা বলে ফেলেই লজ্জা পেয়েছিল। কেন যে তার মন আজ এত বিহ্বল, বয়ঃসন্ধির মতো কেন যে শরীরে এত শিহরন তা সে বুঝতে পারছে না। এই ছেলেটি তার চেয়ে অন্তত পাঁচ ছয় বছরের ছোট, তার ছাত্রীর বর, অথচ তবু কি যে সব গোলমাল হচ্ছে তার মধ্যে।

আপনি এত বড় ফ্ল্যাটে একা থাকেন, আপনার ভয় করে না ?

করে। খুব করে। এখনই তো ভয় করছে। আপনি বসে আছেন বলে করছে না, চলে গেলেই করবে।

এই প্রগলভতার জন্য পরে হয়তো লজ্জা করবে তার, কিন্তু এখন তার অর্গলহীন মুখ থেকে কথাগুলো বেরোলো উত্তপ্ত বুকের

তীব্র শ্বাসবায়ুকে মথিত করে। সে বানিয়ে বলছে না।

সায়ন তার দিকে চেয়ে বলে, কিছু মনে করবেন না, আপনি বিয়ে করেননি কেন ?

এতদিন তেমন কাউকে পাইনি বলে। একবার একটা ভুল করেছিলাম যে !

তার মানে ?

সব শুনে আপনার কাজ নেই। একটু বসুন। অনেকক্ষণ আপনার কিছু খাওয়া হয়নি।

পাগল নাকি ! আমি ঘন ঘন খাই কে বলল আপনাকে ? বরং আপনারই কিছু খাওয়া উচিত। কিন্তু এবার আমাকে যেতেই হবে। মা ভাববে নইলে।

তৃষিতের মতো সায়নের দিকে চেয়ে বাচ্চু বলে, কাল আসবেন ?

আসব। আপনার ছাত্রীকে বলব আসতে।

বাচ্চু একটু যেন শিউরে উঠে বলে, না না, তিতিরের আসবার দরকার নেই।

কথাটা এবং তার সঙ্গে একটা ঝাঁঝ লক্ষ্য করে অবাক হলো কি সায়ন ? কিছু সন্দেহ করল না তো !

তবে সে যাই হোক, সায়ন আবার পরদিনও এল। এবং বেশ সকালেই।

আগের দিন সায়ন চলে যাওয়ার পর থেকেই বাচচু একদম একা আর আনমনা হয়ে গিয়েছিল। দুর্বল শরীর যেন মনের বাঁধভাঙা আবেগ ধরে রাখতে পারছিল না। বিকেলে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতে বাচচু খুব কষে ঝাল দিয়ে একটা আলুর দম করল। আর রুটি। এই শরীরে সেটা অনেকটাই পরিশ্রম। কিন্তু সেই পরিশ্রমের ধকলে রাতে ভাল করে খেতেই পারল না। কৌটোর দুধ গুলে তাই খেল খানিকটা। খাওয়ার এই চেষ্টাও তার পক্ষে অস্বাভাবিক। কারণ সে খেতে মোটেই তেমন পছন্দ করে না। তবু যে জোর করে খেল তার কারণ, না খেলে তার শরীর আরও

শুকিয়ে যাবে এবং তাকে কুচ্ছিত দেখাবে। সায়ন তাকে কুচ্ছিত ভাবলে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই অর্থহীন।

খুব সকালে ঝি এল। তার আসার অনেক আগেই উঠে সাজসজ্জা সেরে নিয়েছিল বাচচু। তৈরি হচ্ছিল প্রত্যাশার উন্মুখ আর একটি হিরণ দিনের জন্য। এমনকি যা সে কখনও ঠোঁটে ছোঁয়ায় না আজ সেই লিপস্টিকও সামান্য হালকা করে দিয়ে নিল ঠোঁটে।

সেই লিপস্টিকের ঠোঁটে সায়ন চুমু খেল বেলা এগারোটা বেজে দশ মিনিটে।

বিস্ফোরণ যদি কিছু ঘটে থাকে, তা ঘটল বাচচুর বুকের মধ্যে। সেখানে এক পাহাড়ি বন্যার ভীষণ স্রোত ভেঙে ফেলছিল বাঁধ। ভাসিয়ে নিচ্ছিল সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন।

একা ঘর। ফাঁকা বিশাল ফ্ল্যাট।

সায়ন বা বাচচু কেউই জানত না এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে যেতে পারে।

বিদায় নেওয়ার আগে সায়ন জিজ্ঞেস করল, আমি আর আসব ?

বাচচু মুখ তুলে স্পষ্ট করে বলল, তোমাকে আসতেই হবে। আমি নইলে বাঁচবই না।

এক রাতে সায়নের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ওদের মিলমিশ কেমন হচ্ছে তা বুঝতে পারছো ?

সায়নের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কই আর হচ্ছে ? দুজনের তো কথাই নেই দেখছি।

নসুকে কিছু আর জিজ্ঞেস করেছো ?

নসুকে জিজ্ঞেস করতে হয়নি, ও নিজেই বলেছে।

এনি ডেভেলপমেন্ট ?

না। তবে—

তবে কি ?

ওদিন যে একটা ছুঁড়ি এসেছিল মনে নেই ! সেই যে বউমার স্কুলের মাস্টারনি !

শুনেছি। তবে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

মেয়েটা নাকি ভাল নয়।

কিসে বুঝলে?

বউমা কথায় কথায় নসুকে বলেছে, তার নাকি বিয়েও হয়েছিল, ডিভোর্স হয়ে গেছে। একা একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে। বয়সের মেয়ে, বুঝতেই তো পারছো।

নসু কিছু বলেছে তোমাকে?

বলেছে, শুনবে? তোমার ছেলে তিন-চারদিন ওই ছুঁড়ির কাছে গিয়েছিল। একা ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে। মেয়েটার নাকি অসুখ। তাই সেবা দিতে গিয়েছিল। শুনলে গা জ্বলে যায়।

সায়নের বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, কাজটা ভাল করেনি। বউমার কানে কি কথাটা গেছে?

তা কে জানে বাবা! গিয়ে থাকলে তো দোষ নেই।

তোমার ছেলের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছো?

কোন ঘেন্নায় বলব? কাল অষ্টমঙ্গলায় যাচ্ছে যাক। ঘুরে এলে বলব একবার।

বোলো। বলাই ভাল। একদম চুপ করে থাকাটা মোটেই ভাল নয়। মেয়েটা কেমন বলো তো!

অত কি আর বোঝা যায় এ যুগের মেয়েদের। তোমার বউমাকে দেখ না। এই তো স্বামীসোহাগের বয়স, কিন্তু মেয়েটা সারাদিন এমন কাঠপানা মুখ করে থাকে, যেন সব রসকষ নিংড়ে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছে। তোমার ছেলের মুখ দেখে তো কিছু বুঝবার উপায়ই নেই।

বড় চিন্তার কথা। কাজটা কি ভুল হলো?

মোটেই ভুল হয়নি। একটু রোসো, ঘি আর আগুন পাশা-পাশি থাকলে কি আর বেশিদিন ওরকম আলগা আলগা থাকতে পারবে? কিছু একটা হবেই।

তোমার কি মনে হয় সান্রর বউমাকে পছন্দ হয়নি ?

সেরকম তো কিছু বলে না। তবে সেটাই ধরে নিতে হবে নইলে বউ তো কিছু ফেলনা নয়।

চেহারা দেখে বলছো ?

স্বভাব দেখেও, কিছু খারাপ তো মনে হয় না।

তাহলে গোলমালটা কোথায় ?

সেটা জানলে তো হয়েই যেত।

ছেলে বা বউয়ের কাছ থেকে তো আর সব খবর বের করা যাবে না। নসুকে লাগাও।

নসু লেগেই আছে।

ভাল। কাল সকালে নসুর সঙ্গে আমি নিজে একটু কথা বলতে চাই।

বোলো। সকালে বর-বউ অষ্টমঙ্গলায় যাবে। নসুকে সকাল-সকাল আসতে বলেছি।

নসু সকালেই এল। কাকভোরে। ইদানীং নসু যোগাভ্যাস এবং ব্রহ্মচর্য করছে। রাত তিনটে থেকে তার দিন শুরু হয়। সে নামধ্যান করে, ঈশ্বরচিন্তা করে, বিষয়-বাসনা, কাম-ক্রোধ থেকে মন প্রত্যাহারের চেষ্টা করে।

আর এসব করে বলেই তার প্রিয় বন্ধু ও ভাই সায়নের ওপর বড্ড রাগ হয়। সায়নের চরিত্রে কোনও ল্যাঙট নেই। এটা সে অতি সম্প্রতি জানতে পেরেছে।

পরশু রাতে দুজনে ছাদে বসেছিল কিছুক্ষণ। তখনই সায়ন বলল, তোকে বিশ্বাস করে সব কথা বলি। আজ একটা ঘটনার কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। শুধু ভয়, তুই আমাকে খারাপ ভাববি।

নসু গম্ভীর হয়ে বলল, তাহলে বলিস না।

তিতিরের সঙ্গে যে দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে সায়ন তাতে এমনিতেই ওপর ওপর নসু খুশি নয়। এসব কথায় তার মন আরও বিষিয়ে যেতে চাইছে।

সায়ন একটু হেসে বলে, অত রেগে আছিস কেন? তিতিরের সঙ্গে যে বনছে না তার জন্য আমি তো একা দায়ী নই।

তোরা দুটোই রাম বোকা এবং অহংকারী।

তাই হবে।

কী বলতে চাইছিলি?

সায়ন মাথা নত করে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ছাদের শানের ওপর আঙুল দিয়ে বার বার ঢ্যাঁড়া কাটছিল। ওভাবেই বলল, দোষটা ঠিক আমারও নয়। ওই মেয়েটা এমনভাবে অ্যাপ্রোচ করল।

মেয়ে! বলে নসু হাঁ করে থাকে, কে মেয়ে রে। আবার কী কাণ্ড ঘটালি?

দেখ, শরীর-বিজ্ঞানে বলে ছেলেরা স্বভাবতই পলিগ্যামস, বহু-গামিত্বই তাঁদের ধাত। তাহলে দোষটা কোথায় বল?

দোষ কবুল করার আগেই সাফাই গাইছিস কেন? কোন মেয়েটার কথা বলছিস?

তিতিরের সেই দিদিমণি।

নসু বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ওই বাচচু না কি নাম যেন! ডিভোর্সি।

হ্যাঁ।

তুই তার সঙ্গে জুটলি কি করে?

সে অনেক কথা। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল, কি নাকি কথা আছে।

সে মেয়েটা তো একা একটা ফ্ল্যাটে থাকে! তুই সেখানে গিয়েছিলি! সর্বনাশ!

সর্বনাশ কিসের ! আমি তো পুরুষমানুষ।

শুধু সেটাই তোর সান্ত্বনা ? আর কোনও ফ্যাক্টর নেই ?

আই ওয়াজ সিডিউসড বাই হার।

নসু প্রচণ্ড রেগে গেল বলে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর বলল, তুই ? তোর মুখে এই কথা ! তুই তো কখনও মেয়েদের মুখের দিকে তাকাসনি ? তুই না মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার কথা বলতিস ? তার ওপর সবে বিয়ে হয়েছে। ঘরে নতুন বউ। এটা কি করলি সানু ? এ যে সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা !

সায়ন অন্যদিকে চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি মেয়েদের ব্যাপারে কিছু জানতাম না। তিতিরকে এখনও আমি স্পর্শও করিনি। বোধহয় তিতির আমাকে অপমান করার চেষ্টা করে বলেই আমার ভিতরটা গরম হয়েছিল। কি জানি কেন হয়ে গেল।

নসু দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, এ যে ভাবা যায় না রে ! অন্তত তোর কাছ থেকে ভাবা যায় না। ওই মহিলা কেমন মানুষ ? এ কাজ করল কেন ?

বাচ্চু খারাপ মানুষ নয়। তার অসুখ করেছিল। আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম সেই সময়ে।

অসুখ ! বলে নসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, অসুখই তো ! অসুখ ছাড়া আর কীই বা বলা যায় এটাকে ?

তোকে বললাম, কারণ তোকে না বলে আমি থাকতে পারি না। কাজটা খারাপ হয়েছে বুঝতে পারছি, কিন্তু এখন আমি কী করব বলে দে।

নসু উত্তেজনা সামলে নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করতে মনে মনে একটু জপ করে নেয়। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখে বলে, ফিজিক্যাল ইনভলভমেন্ট তো হয়েই গেছে, কিন্তু ইমোশন্যাল ইন-

ভলভমেন্ট কতটা ? তুই ওর প্রেমে ট্রেমে পড়ে যাসনি তো ?

সায়ন আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ওকে আমার বেশ লাগে। সেটা কিরকম, প্রেম কিনা জানি না। আমার তো প্রেমের অভিজ্ঞতা কিছু নেই।

তার মানে ব্যাপারটা জটিল। মেয়েটা কি বলছে ?

শী ইজ জাস্ট ম্যাড অ্যাবাউট মী। পাগলের মতো ভালবাসে।

নসু মাথা নেড়ে বলে, তাহলে শুধু জটিলই নয়, বিপজ্জনকও।

বিপজ্জনক ! তা কেন ?

মেয়েরা যখন ইমোশনের পাল্লায় পড়ে তখন অনেক বেশি ডেসপারেট হয়।

সায়ন মাথা নেড়ে বলে, ও ডেসপারেট।

কোনও প্রস্তাব দিয়েছে ?

সায়ন একটু মিনমিন করে বলে, তা দিয়েছে।

মেয়েটা বয়সে তোর চেয়ে অন্তত পাঁচ ছয় বছরের বড়। তাই না ?

হবে হয় তো।

তার ওপর তুই ওর ছাত্রীর বর। তোর ঘেন্না হয় না ?

সায়ন মাথা নেড়ে বলে, এখনও হয়নি। বলেছি তো, বাচচুকে আমার ভালই লাগে।

তোর ইচ্ছেটা কী ?

সায়ন আবার নেতিবাচক মাথা নেড়ে বলে, এ ব্যাপারে ডিসিশান নেওয়ার মতো বুদ্ধি বা বিবেচনা আমার এখন কাজ করছে না। তাই তোকে বলা।

আমি যা বলব তা শুনবি ? ততটা বুকের জোর কি তোর আর আছে ?

সায়ন অনেকক্ষণ বাদে নসুর চোখে চোখ রাখল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, তোর মতো সংযম আমার নেই এটা ঠিক কথা। কিন্তু

তোকে তো বললাম আমার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। এখনও নেই। হ্যাঁ রে, মনের কি জ্বর হয়?

তার মানে?

আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছে, শরীরে নয়, কিন্তু আমার মনের খুব জ্বর। সবসময়ে ভিতরটা যেন আগুনের হলকায় পুড়ে যাচ্ছে। আমি স্বাভাবিকভাবে কিছু ভাবতে পারছি না। উচিত অনুচিতের বোধও হারিয়ে যাচ্ছে।

নসুর শ্বাস কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। নিজেকে অনেক কষ্টে স্থির রেখে সে বলে, মনের জ্বর হয়তো হয়। তবে আমার কখনও হয়নি বলে অভিজ্ঞতা নেই।

হলে বুঝতি। আমার এখন একজন বন্ধু দরকার, যে আমাকে ঘেন্না করবে না, আমার ওপর রাগ করবে না, ভালবেসে সিম-প্যাথিটিক্যালি গাইড করবে। নসু, তুই ছাড়া আমার তেমন বন্ধু আর কে আছে?

সায়নের গলায় চেপে রাখা কান্নাটা যেন দূরের বৃষ্টির খবর যেমন বাতাসে ভেজা সোঁদা গন্ধের মতো ভেসে আসে তেমনই এল। নসুর মনটা ভিজে গেল তাতেই। এই সরলমতি, বয়সের তুলনায় ছেলেমানুষ সায়নকে সে বড্ড ভালবাসে। চিরকাল আদরে আদরে বড় হয়েছে বলে দুনিয়ার আঁচটাই ওর গায়ে লাগেনি। আর একই বয়সের নসুকে এই বয়সেই কতো না শক্তপোক্ত অভিজ্ঞ হতে হয়েছে পারিপার্শ্বিকের চাপে।

নসু বলে, ওঠ।

কোথায় যাবো?

তিতিরের কাছে যাবি।

গিয়ে?

সব কবুল করবি।

সায়ন চোখ কপালে তুলে বলে, খেপেছিস?

কেন করবি না ? বাধাটা কিসের ?

বিশ্রী সিন ক্রিয়েটেড হতে পারে।

তা হয়তো হবে। কিন্তু ঘটনাটা তিতিরের জানা দরকার।

এই তোর আমার প্রতি ভালবাসা ? যে কথা কাউকেই বলার নয়, বিশেষ করে বউকে তো নয়ই, সেই কথা তার কাছেই বলতে বলছিস ?

শোন গাড়ল, যদি এ সময় তোকে কেউ সত্যিকারের গাইড করতে পারে তবে সে তিতির।

তোর মাথা বিগড়ে গেছে। তিতির এমনিতেই আমাকে ঘেন্না করে। এ কথা বললে ও এমন কাণ্ড করবে যে মা বাবার কানে পেঁৗছে যাবে।

নসু চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল।

সায়ন ভয়ে ভয়ে বলে, আবার কী মতলব আঁটছিস ?

আমি তিতিরের সঙ্গে তোকে নিয়ে অনেক কথা বলেছি।

সে তো জানি। ও আমাকে ভেড়া বলে মনে করে।

ভেড়া ! ও কথাটা ও উচ্চারণ করেনি।

এ কথা তো বলেছে যে, মা-বাপের ব্যক্তিত্বহীন ছেলে ?

তা বলেছে। কথাটা মিথ্যেও নয়।

দেখ, এখন ওসব কথা থাক। আমার মন ভাল নেই।

নসু ওর হাতটা ধরে বলে, যা বলছি শোন, খারাপ হবে না।

নসু আমাকে কিন্তু আত্মহত্যা করতে হবে তাহলে।

নসু জানে, আত্মহত্যা সবাই করতে পারে না। তার হিসেব-মতো সায়ন আত্মহত্যা করার মতো মানুষ নয়। নসু নিজেও নয়। তবু মাঝে মাঝে মাথায় একটা উটকো উদ্বেগ ভর করলে মানুষ কী করে না-করে তার তো কোনও ঠিক নেই। তাই সে দ্রুত মনে মনে একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশন স্থির করে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওঠ পাগলা, ঘরে যা। আমিই যা করার করব।

তোকে ভাবতে হবে না। তবে একটা কথা দিতে হবে।

কি কথা ?

আর ওই মহিলার ছায়া মাড়াতে পারবি না।

সায়ন মুখখানা করুণ করে বলে, ওর কী দোষ ?

দোষটা তবে কার ঘাড়ে চাপাতে চাস ? নিজের ঘাড়ে !

বোধহয় আমারই।

যখনই কোনও মেয়েছেলের দোষ নিজের ঘাড়ে নেওয়ার ইচ্ছে যায় তখনই কিন্তু বুঝতে হবে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। বুঝলি ! ফিজিক্যাল যা হওয়ার হয়ে গেছে, ওটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যাবে। কিন্তু যদি মন মজে থাকে তাহলে কিন্তু গভীর গাড্ডা।

তুই কি ভাবিস আমি নেহাতই একজন কামুক পশু ? এমন একখানা ভাব করছিস যেন আমি শুধু ওসবের কাঙাল। তাই যদি হবে তাহলে তোকে বলতাম নাকি ?

তাও বটে ? বলে নসু আবার ভাবিত হলো। ফের ছাদের ওপর ধপ করে বসে বলল, তোর যে কত ল্যাটা তাই ভেবেই পাগল হয়ে যেতে হয়। শুধু শরীরের ব্যাপার নয় বলছিস ?

সায়ন অত্যন্ত গোমড়া মুখে বলে, না, আমি লম্পট নই।

নসু করুণ একটু হাসল। লাম্পট্য কাকে বলে কে জানে বাবা ? যাকগে, আমি তোকে বাঁচাতে চাইছি। যদি ভাল চাস তাহলে আপাতত মেয়েটার কাছে যাস না।

সায়ন কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, না গিয়ে পারব না। আমি ওকে একদম ভুলতে পারছি না।

মাত্র তিন দিনেই এত ! এটা তো স্বাভাবিক নয় রে ! প্রেম ভালবাসা গাঢ় হতে সময় লাগে। এত আঠা তোর কোথায় ছিল ?

ওরকম রক-এর ভাষায় কথা বলিস না তো ! শুনতে ভাল লাগে না।

ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ সায়নের দিকে চেয়ে থেকে নসু বলে,

মেয়েটার ঠিকানাটা দে।

সায়ন সভয়ে বলে, ঠিকানা! ঠিকানা দিয়ে কী করবি? গিয়ে হামলা করবি নাকি?

নসু মাথা নাড়ল। হামলা হুজ্জত করতে গেলে উল্টে ঝাড় হয়ে যেতে পারে। ওসব নয়। জাস্ট একটু বাজিয়ে দেখব ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে?

না। তোকে ওসব করতে হবে না।

তাহলে অল্টারনেটিভটা কী? আমাকে যখন প্রবলেমটার কথা বলেছিস তখন সলিউশনটাও তো বের করতে হবে।

এখন থাক।

ফেলে রাখলে তুই আরও গাড্ডায় যাবি। তখন তোকে টেনে তোলা যাবে না। বিষের গাছ অংকুরেই বিনাশ করা দরকার।

বই থেকে কোট করছিস নাকি!

কথাটা খারাপ লাগলেও কিন্তু সত্যি।

তোকে কিছু করতে হবে না। আমাকেই বরং ভাবতে দে।

তুই তো ভাববিই। কিন্তু সে ভাবনাটা কাজের হবে না।

দেখ নসু, মেয়েটা কিছু অন্যায় করেনি। একজনকে ভালবেসে ফেলেছে এটা ছাড়া আর কোনও গুরুতর অপরাধ তো নয়।

ওরে তোর এখন মাথার ঠিক নেই। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা বিচার করতে গেলে একটা ডিটাচমেন্ট লাগে। তোর সেটা নেই। যে লোকটা খুন করে তারও সাফাই গাইবার মতো যুক্তি থাকে। আমি উঠছি এখন।

কাউকে কিছু বলবি না তো!

চোখ পাকিয়ে নসু বলে, কোনওদিন বলেছি?

না। শোন যা করার আমিই করব। তুই কিছু করিস না, প্লীজ।

আচ্ছা।

নসু চলে এল বটে, কিন্তু ফাঁক বুঝে যখন সায়ন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন সে সোজা তিতিরের ঘরে হানা দিল।

তিতির এই কয়েকদিন নসুকে খুব পছন্দ করেছে। এই সহজ, সংযত, স্বাভাবিক যুবকটি খুব নির্ভরযোগ্য, খুব বিশ্বাসযোগ্যও। পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এই মানুষটিকে তার যথেষ্ট শ্রদ্ধাও হয়।

এক গাল খুশির হাসি হেসে তিতির বলে, এসো নসুদা। মুখ অত গম্ভীর কেন ?

আরে এ বাড়িটাকে তো তোমরা গোমড়ামুখোদের আস্তানাই করে তুলেছ। ভেরি কন্টেজিয়াস ডিজিজ। পিসিমা ফিউজ, পিসে ফিউজ, তুমি আর সানু তো আগে থেকেই ফিউজ।

মোটেই না। আমি এমনিতেই একটু সাবডিউড থাকি। ওটা আমার স্বভাব। কিছু খেয়েছো ?

খেতেই তো আসি। এই বডিতে যে ফুয়েল লাগে তা যোগাবে কে ? পিসি ছিল বলে পেট ভরে দুটো খেতে পাই।

তিতির বিষণ্ণ মুখে বলে, তুমি ওরকমভাবে বোলো না তো। শুনতে আমার চোখ ফেটে জল আসে। এখন তো আর তুমি তত গরিব নও। চাকরি তো করছো।

তা করছি। আরে ভাই, মুখে যাই বলি, আমি তত দুঃখীও নই। আমার স্বভাবেই দুঃখ ব্যাপারটা নেই কিনা। কষ্টকে কষ্ট বলে কখনও মনে হয়নি। এখন শোনো, সঙ্গে কাজের কথা আছে।

তিতির স্নান করে তার লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছিল। চিরুনিটা রেখে খাটে বসে পা একটু দোলাতে দোলাতে বলল, বলো।

তোমার এক দিদিমণি ক'দিন আগে হঠাৎ উদয় হয়েছিল কেন বলো তো ?

বাচ্চুদি ! বলে তিতির যেন একটু আনমনা হয়ে ঠোঁট উল্টে বলে, কি জানি কেন ? বিয়েতে নেমন্তন্ন করা সত্ত্বেও আসেনি।

কিন্তু ফুলশয্যার পরদিন সকালে হঠাৎ এসে হাজির। বলল, সায়নের সঙ্গে নাকি কথা আছে।

কি কথা কিছু আন্দাজ করতে পারো না ?

তিতির লজ্জায় একটু লাল হয়ে নতমুখে বলল, বোধহয় এই বিয়ের বিরুদ্ধেই কিছু বলতে এসেছিল। বাচ্চুদি খুব আপরাইট, ভীষণ ঠোঁটকাটা। বিয়ের আগে আমার বাবা আর মাকেও অনেক কথা শুনিয়ে এসেছে, পুলিশের ভয় অবধি দেখিয়েছে।

ভদ্রমহিলার ব্যক্তিগত জীবন কেমন ?

কেন, ওসব জিজ্ঞেস করছো বলো তো ? কি হয়েছে ?

কিছুই হয়নি। কাজ আছে।

যাঃ, ওকে নিয়ে তোমার আবার কী কাজ থাকবে ? বাচ্চুদি আমাকে প্রাইভেট পড়াতো, কাজেই কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল। ওর জীবনটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স, স্বামীটা আবার বিয়েও করেছে। বাচ্চুদি একা থাকে।

ওর ঠিকানাটা ?

তুমি বড্ড বেশি ইন্টারেস্ট নিচ্ছ। কেন বলো তো !

নসু মিথ্যে কথা বড় একটা বলতে চায় না পারতপক্ষে। কিন্তু এখন বলল, মহিলা এসেছিলেন সায়নকে অপমান করতে। পিসি এবং পিসেকেও। শরীর ভাল ছিল না বলে সেদিন সুবিধে করতে পারেননি। কিন্তু সায়নের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ শুনেছি।

নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে নিয়ে গিয়ে উনি সায়নকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছেন, সেটা জানো ?

তিতির অবাক হয়ে বলে, কই কেউ বলেনি তো আমাকে !

সায়ন নালিশ করার মতো ছেলে নয় ! বড্ড নরম আর একটু

ভীতু। বিশেষ করে মেয়েদের জুজুর মতো ডরায়। হাজির-জবাবও দিতে জানে না। জরুরী কথা বলবে বলাতে বোকাটা গিয়ে হাজির হয়েছিল মেয়েটার ফ্ল্যাটে। একা পেয়ে এমন অপমান করেছে যে সানু পালানোর পথ পায় না। পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে সেদিন।

তিতির এত অবাক হলো যে হাঁ করে রইল কিছুক্ষণ। তার রুদ্ধ মুখে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, সেটা তোমার ভাইয়ের উচিত ছিল আমাকে জানানো।

তোমাদের কি টকিং টার্মস আছে ?

মাঝে মাঝে মনো সিলেবলে কথা তো হয়। বলে তিতির আবার একটু রঙিন হলো।

এবার তোমাকে আরও একটু সিরিয়াস কথা বলব।

তিতির মুখ তুলে বলে, বলো না।

সানু খুব নরম ছেলে। তার চেয়েও বড় কথা ওর মধ্যে কোনও দৃঢ়তা নেই। সহজেই আবেগে ভেসে যায়।

হঠাৎ ভাইয়ের গুণকীর্তন করছো কেন নসুদা ?

তোমার এই বয়সে যতটা মানসিক শক্তি আছে ততটা সানুর নেই।

আমি তোমার ভাইকে খুব বেশি চিনি না কিন্তু।

ওটা বাজে কথা। তুমি ওকে রিজেক্ট করে থাকতে পারো, কিন্তু তা বলে লক্ষ্য করো না এটা সত্যি কথা নয়। ঠিক বলেছি ?

তিতির ফের রাঙা হলো, লক্ষ্য করার কিছুই তো নেই। জাস্ট এক ঘরে থাকতে গেলে যা একটু দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

ওটুকুই যথেষ্ট। ওর সম্পর্কে তোমার একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে তো! কেমন লোক ?

ওটা থাক নসুদা।

তুমি কি ওকে ঘেন্না করো ?

না, তা কেন ?

বিয়ে করাটা কিন্তু ওর দোষ নয়। হি ওয়াজ ফোর্সড টু ম্যারি।

সেটাও জানি।

তাহলে ওর দোষ কোথায় ?

আমি ওর দোষের কথা কখনও তো বলিনি তোমাকে।

না, নট ইন সো মেনি ওয়ার্ডস্। কিন্তু বোঝা তো যায়।

প্রসঙ্গটা থাক না।

নসু আচমকাই গলা তুলে বলল না, থাকবে না। ইউ আর ডুয়িং এ গ্রেট হার্ম টু দি ম্যান।

তিতির এই আচমকা উচ্চকণ্ঠে একটু চমকে গেল, কী বলছো ?

শোনো, তোমার দিদিমণিটি কী করেছে তা জানো ?

এই তো বললে ওকে অপমান করেছে। মোটেই ভাল কাজ করেনি : এটা বাচ্চুদির অনধিকার চর্চা।

যদি আরও সাংঘাতিক খবর তোমাকে দিই।

হঠাৎ তিতির ভয়ে সাদা হয়ে গেল। ওর মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে কিশোরীর রহস্যময় ভয়ের চেহারা এত প্রকট হলো যে নসুর একটু মায়া হচ্ছিল। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর আর হয়তো বাঁধ দিয়েও বেনো জল আটকানো যাবে না।

গলাটা নামাল নসু। সে নিয়মিত নাটক করে। গলার খেলা এবং কেরামতি তার ভালই জানা। চাপা জরুরী কণ্ঠে সে বলল, তোমার দিদিমণি সানুকে অপমান করেননি, করেছেন তোমাকে।

তিতির অস্ফুট গলায় বলে, তার মানে ?

তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম তিতির। একা ফ্ল্যাটে তোমার অসুস্থ দিদিমণি যা করেছেন সেটা যে কোনও মেয়ের পক্ষেই অপমান। সানুটা গাধা বলে, মনের জোর নেই বলে ভেসে গেছে। যা ঘটেছে তার ডিটেলস জানতে চেও না। তবে সানুর

মতো একটি শুদ্ধ পবিত্র ছেলেকে ফাঁদে ফেলা শক্ত কাজ নয়। তোমার বাচ্চু দিদিমণি খুব সহজেই কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছেন।

তিতির দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে চোখ বুজে ফেলল। নসু দেখতে পেল, তিতির কাঁপছে। শরীরটা দুলছে। হয়তো পড়ে যাবে।

একটু বিরক্ত গলায় নসু বলে, যে কাজ তোমরা দুজনে মিলে করেছো তার প্রতিফলই তো এটা। তুমি আর সানু যদি একটা অহং-এর লড়াই লাগিয়ে দুজনে দুজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে না থাকতে তাহলে এটা হতে পারত না। এখন শকড্ হয়ে কী হবে বল তো! কেন তোমরা দুজনে দুজনকেই রিজেক্ট করলে অকারণে?

তিতির দুহাতের পাতায় মুখ সজোরে ঢেকে ফেলে ফাঁপা গলায় বলে, আর বলো না, পায়ে পড়ি।

শুনতে হবে তিতির। আরও আছে। বাচ্চু সানুকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তোমাকে ডিভোর্স করে যাতে সানু ওকেই বিয়ে করে।

এবার তিতির আর পারল না। অস্ফুট একটা কাতর ধ্বনি করে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়।

নসু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল চুপচাপ। তারপর আপনমনেই বলল, তাহলে তুমি লৌহমানবী নও! বাঁচা গেল।

নসু একটু হাসলও আপনমনে। তারপর কাচের জগ থেকে জল হাতের কোষে নিয়ে নির্মম কয়েকটা ঝাপট দিল তিতিরের চোখে মুখে। বিছানা ভিজে গেল, কিন্তু নসু ভ্রূক্ষেপ করল না।

তিতির চোখ মেলল।

নসু ধমকের গলায় বলল, এত তাড়াতাড়ি হেরে যাচ্ছো কেন?

তিতির অর্থহীন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, সব সত্যি নসুদা?

সত্যি। হাণ্ড্রেড পারসেন্ট। কিন্তু তুমি যদি সানুকে রিজেক্ট করেই থাকো তাহলে এ খবরে তোমার আঘাত পাওয়ার কি আছে?

তিতির বালিকার মতোই শব্দ করে কেঁদে উঠল। তারপর হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। নসু সময় দিল। তার তাড়া নেই।

আমি কি চলে যাবো তিতির?

না না, তুমি বসো।

কিছু বলবে?

বলবো।

তাহলে আর কেঁদো না। ওতে সময় নষ্ট ছাড়া কিছু হবে না। আমার প্রশ্নটার জবাব দেবে কি? সানু যদি তোমার এতই পর তাহলে যার সঙ্গে খুশি যা খুশি করুক, তোমার কি যায় আসে?

তিতির অশ্রুসিক্ত মুখ তুলল। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিয়ে বলল, তুমি সত্যি বলছো তো!

বলেছি তো হাণ্ড্রেড পারসেন্ট। সানু কোনও কথা আমার কাছে গোপন করে না।

তোমাকে নিজের মুখে বলেছে?

হ্যাঁ, ভীষণ গাড্ডায় পড়ে গেছে গাধাটা। জল যে কতদূর ঘোলা হবে কে জানে! এনিওয়ে, তোমাদের ব্যাপারে আমি আর থাকছি না। সানুর এই অধঃপতন আমি সহ্যও করতে পারছি না। কেমন মানুষ তোমার এই বাচ্চুদি?

তিতির একটিও কথা বলতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাইরের দিকে।

নসু ঠিক এই মুহূর্তটিকে নাটকীয়ভাবে কাজে লাগাতে নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বক্সাররা ঠিক বুঝতে পারে নক আউট পাঞ্চ মারতে পেরেছে কি না। নসুর মনে হচ্ছিল, পেরেছে সে।

আজ অষ্টমঙ্গলার যাত্রায় জোড়ে রওনা হবে দুজনে। বেনারসী আর গয়নায় সেজে তৈরি হয়েছে তিতির। এক রাত্তিরে সে অনেক রোগা হয়ে গেছে। অনেক সাদা। পরশু রাতে ছাদে শুয়েছিল নসু আর সায়ন। অনেক কথা হয়েছে দুজনে। পুরোনো দিনের কথা। একবারও নসু তিতির বা বাচ্চুর প্রসঙ্গ তোলেনি। সায়ন হয়তো এক আধবার তুলতে চেয়েছে, নসু এড়িয়ে গেছে। সায়ন আজ তিন দিন হলো ছাদেই শুচ্ছে। তিতিরের সঙ্গে ওর দেখাই নেই প্রায়।

আজ কাকভোর থেকে নসু অপেক্ষা করছে, তিতিরকে কখন একা পাবে। সাতটা নাগাদ ঘর থেকে তিতির বেরিয়ে এলে সিঁড়ির চাতালে দেখা হলো।

তিতির!

নসুদা! বলেই কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিল তিতির।

চুপ। আমি কান্নায় বিশ্বাসী নই। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, পারবে ওকে বাগে আনতে?

জানি না।

চেষ্টা করবে? কথা দাও।

তিতির ওপর নিচে মাথা নাড়ল, চেষ্টা করব।

নসু হাসল। মেয়েরা ইচ্ছে করলে কী যে পারে তা তারা নিজেরাই জানে না। ওকে অপমান করার দরকার নেই।

করব না।,

কী করবে?

তিতির ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, বলব কেন?